প্রতিদিন
৭ মে ২০০৬

ওরিয়েন্ট লংম্যান

রোববার

সংবাদ প্রতিদিন এর সঙ্গে বিনামূল্যে

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

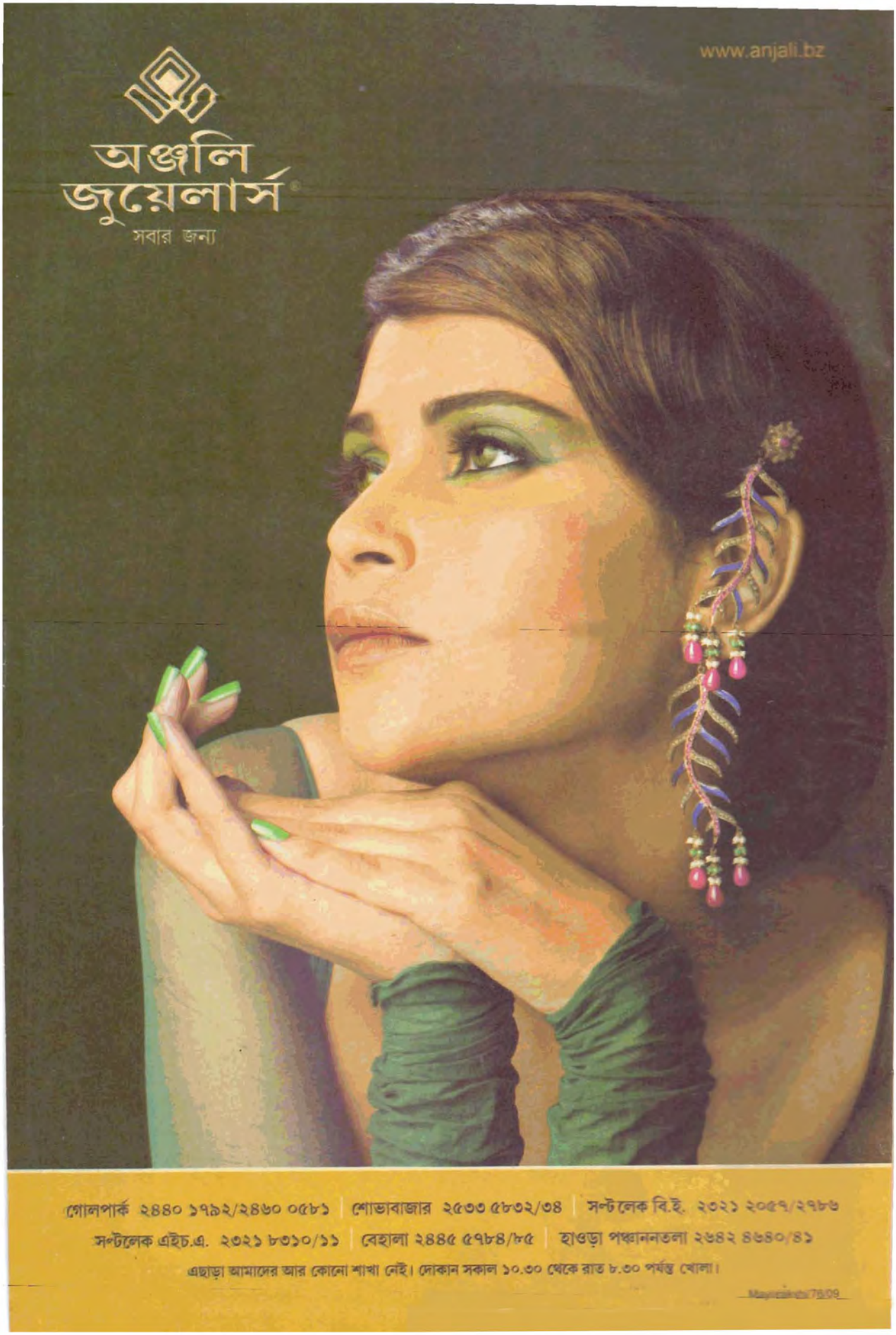

গোলপার্ক ২৪৪০ ১৭৯২/২৪৬০ ০৫৮১ | শোভাবাজার ২৫৩৩ ৫৮৩২/৩৪ | সল্টলেক বি.ই. ২৩২১ ২০৫৭/২৭৮৬

সল্টলেক এইচ.এ. ২৩২১ ৮৩১০/১১ | বেহালা ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ | হাওড়া পঞ্চাননতলা ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১

এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই। দোকান সকাল ১০.৩০ থেকে রাত ৮.৩০ পর্যন্ত খোলা।

৩ মে ২০০৯
সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে

লেটারবক্স
পাঠকের পাতা ৪
ফার্স্ট পার্সন
ঋতুপর্ণ ঘোষ ৬
ভালো-বাসার বারান্দা
নবনীতা দেবসেন ৮
এবার মলাট
ওরিয়েন্ট লংম্যান
গোপন খাতায় মহাভারত
উজ্জ্বল চক্রবর্তী ১০
ব্যাপার সহজপ্রাচ্য নয়
চন্দ্রিল ভট্টাচার্য ১৮
গোসাঁইবাগান
জয় গোস্বামী ২৬
রোববারের শায়েরি
দোজখনামা
রবিশংকর বল ৩০
রোববারের মেগা
ঝিলডাঙার কন্যা
প্রচেত গুপ্ত ৩৪
রান্নাঘরে রেস্তোরাঁ
ইউ চু-এর চিমনি স্যুপ ৪০

সৌজন্য : সন্দীপ রায়
রে সোসাইটি

প্রচ্ছদ : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

টিম রোববার

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
নীলাঞ্জনা বসু
প্রসূন চক্রবর্তী
বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী
বিপুল গুহ
ভাস্কর লেট
রিংকা চক্রবর্তী
রাজু সরদার
শান্তনু দে
সন্তোষ দত্ত
সুপ্রিয় দাস

সম্পাদক ঋতুপর্ণ ঘোষ
সহযোগী সম্পাদক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক
বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

Rediffusion-Y&R/Kol/SG/1143

স্লোগানে স্লোগানে ঢাকা দেয়ালে দেয়ালে

এখন থেকে আমাদের কাছে ১৪ নভেম্বর আর শুধু শিশুদিবস নয়, মিছিলদিবসও বটে। এমন মিছিল শুধু বাংলায় নয়, ভারতবর্ষেও কখনও হয়েছে কি না, আমার জানা নেই।

বাংলাদেশের ২১ ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক মিছিলের পর বাঙালি বোধহয় দ্বিতীয়বার দেখল এমন সর্বজনীন মিছিল, যাকে ঐতিহাসিক বলা যেতেই পারে।

সত্যের জন্য, শুভবোধ জাগ্রত করার জন্য, মানুষ ও মনুষ্যত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই মিছিল অবশ্যই ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে। রোববার সেই মিছিলের জীবন্ত ছবি তুলে দিয়ে, আলোচনার আসর বসিয়ে বাঙালির পাতে মাছ-মাংসের পাশাপাশি শুভবোধের উৎকৃষ্ট নিরামিষও তুলে দিল!

ঋতুপর্ণ ঘোষের 'ফার্স্ট পার্সন'-এর পাশাপাশি জয় গোস্বামীর 'মিছিল এই পথ দিয়েই যাবে' ইতিহাসের পুনরালোচনা যেন। ঋতা বসুর 'যাত্রিক' তো ইতিহাসের জীবন্ত দলিল।

জয়দা ঠিকই বলেছেন, '১৪ মার্চ ২০০৭-এর পর, শিল্পী লেখক নাট্যকর্মী ছোটপত্রিকার সম্পাদক, এঁদের মধ্যে স্পষ্ট একটি ফাটল তৈরি হয়েছে।' কিন্তু সেই ফাটল মহাসাগর হলেই তো বিপদ! বুদ্ধজীবী বনাম বুদ্ধিজীবী সংঘাত যেন ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ইতিহাসের পাতায় আবার উঠে আসতে চাইছে লালগড়। আবার হয়তো আমাদের পথে নামতে হবে। তবে গণহত্যার পরে নয়, আগে হলেই ভাল। যুবশক্তির মধ্যে আরও বেশি করে শুভবোধ জাগ্রত হোক।

সোফিয়ার রহমান

ঐতিহাসিক মিছিল

'মিছিল' সংখ্যাটি সুন্দর এবং সাহসী প্রয়াস—যার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। জয় গোস্বামীর 'মিছিল এই পথ দিয়েই যাবে' প্রতিবেদনটিতে যে সারমর্ম তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তা অনবদ্য। এত সহজ ভাষায় ঐতিহাসিক মৌনমিছিলটি ব্যক্ত করেছেন—যেটা পরবর্তী প্রজন্মের তরুণ ও তরুণীদের কাছে এক অনুপ্রেরণার সাক্ষী হয়ে থাকবে বলেই বিশ্বাস রাখি। পাশাপাশি ঋতা বসুর 'যাত্রিক' অত্যন্ত মানানসই এবং মনোগ্রাহী। মিছিলকে কেন্দ্র করে এই সংখ্যায় তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু ছবি বেশ ভাল। মিছিল নিয়ে এমন এক সংখ্যা প্রকাশের জন্য 'টিম রোববার'কে জানাই অভিনন্দন।

প্রবালকুমার ঘোষ

অনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী

জয় গোস্বামীর 'মিছিল এই পথ দিয়েই যাবে' লেখা পড়ে বিস্তারিতভাবে জানলাম ১৪ নভেম্বর ২০০৭-এর মিছিল নিরপেক্ষ, না নিরপেক্ষ নয়। এই বিষয়ে ব্যাখ্যাও পেলাম সেই মিছিলেই থাকা জয় গোস্বামীর কাছ থেকে। আমি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে বুঝি নিরপেক্ষ মানে কোনও পক্ষের হয়ে না থাকা। বুদ্ধিজীবী মানে যাঁর মনের মধ্যে শুভবুদ্ধি আছে, যা দেশের উন্নতি ঘটায়। যাঁর বুদ্ধিতে কিছু ভাল উন্নয়নমূলক, সমাজকল্যাণমূলক কাজ হতে পারে। এমন মানুষরা যদি মিছিল করে প্রতিবাদ করেন বেশ ভাল লাগে। কিন্তু যাঁরা নিজেদের নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী বলে মিছিল করেন শুধু এক পক্ষের দোষ দেখিয়ে, তখন ভাল লাগে না। তখন মনে হয়, সাধারণ মানুষকে হয়রান করছেন, ভুল বুঝিয়ে আরও উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছেন। কোনও বুদ্ধিজীবী যখন কোনও রাজনৈতিক ধরনা মঞ্চ, ভাসন মঞ্চ বা অনশন মঞ্চে যান তখন সেই বুদ্ধিজীবী কখনও নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না। তিনি সেই পক্ষেরই হয়ে যান। সাধারণ মানুষ এই ব্যাপারটা এখন বুঝে গিয়েছে আর বুঝেছে বলেই সাধারণ মানুষ এখনও নিরপেক্ষ।

সুরজিৎ শীল

বাজারচলতি বিষয়

রোববার-এর 'মিছিল' সংখ্যাটি বড়ই হতাশ করল। আমজনতা রোববার-এ গতানুগতিক বিষয়বস্তু ছাড়া নতুনত্বের স্বাদ পেতে চায়। রোববার ম্যাগাজিনটি পাঠককুলে এই স্থানটি সুন্দরভাবে গ্রহণ করেছে। তবে মাঝেমধ্যেই 'গরু' রচনার মতো সিঙ্গুর আর নন্দীগ্রামের কথা ভেসে উঠছে। যশস্বী লেখকরা সমাজে কোনও করুণকাহিনির প্রতি নজর দেন না। কিন্তু সিঙ্গুর আর নন্দীগ্রামের ঘটনা নিয়ে বারবার উতলা হলে পাঠককুল ধৈর্য হারায়। তা হলে রাজনৈতিক পত্রপত্রিকাগুলো খাবে কী? 'মিছিল' সংখ্যায় মিছিলের ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ কিছুই জানা গেল না। শুধুই প্রকাশিত হল নন্দীগ্রামের মিছিলের যৌক্তিকতা। প্রতিবাদী, বুদ্ধিজীবী, লেখক, অভিনেতা—প্রত্যেক সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষজন অতিরিক্ত প্রচারে কচলানো লেবুর মতো যে তেতো হয়ে যান, তা কি আমরা মানি? সম্পাদকমশাই আপনাকে অনুরোধ, বাজারচলতি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে রোববার-এর মলাটকাহিনি করবেন না।

পল্টু ভট্টাচার্য

আপোশহীন পত্রিকা

'মিছিল এই পথ দিয়েই যাবে'—জয় গোস্বামীর এই লেখা পড়তে পড়তে শুনতে পেলাম নিঃশব্দ মিছিলের উচ্চারিত যন্ত্রণা। ১৪

নভেম্বর ২০০৭-এর এমন শরীরী মিছিল—এর আগে কখনও দেখিনি। এমন স্বতঃস্ফূর্ত পায়ে পায়ে মিলে যাওয়া শৃঙ্খলিত বন্ধন আগে কখনও চোখে পড়েনি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিঃশব্দে গর্জে ওঠার শব্দ আগে কখনও শুনিনি। ১৪ নভেম্বর '০৭ বুঝিয়ে দিয়েছিল কাকে বলে প্রতিবাদের ভাষা, প্রতিরোধের আগুন। তাই এইদিন কখনও মলিন হবে না, হারিয়ে যাবে না। যাঁরা কোনওদিন মিছিলের ধারেকাছে ঘেঁষেননি—মিছিলের আহ্বানে তাঁরাও মানবতার বন্ধনে মিলেমিশে একাকার হয়েছিলেন। এই মিছিলের রূপ, বর্ণ, মাত্রা, আঁচ, গভীরতা ছিল তাই অন্যরকম। বিরল শিকড়ের টানে সেদিনের মিছিল চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। যে মিছিলের ব্যাপ্তি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, যার আদি-অন্ত মাপা যায় না—তাকেই অনন্য আঙ্গিকে তুলে ধরে প্রতিবাদকে সম্মান জানাল রোববার। আপোশহীন পত্রিকা হয়ে রইল।

হীরালাল শীল কলকাতা

ন্যায্য অধিকার

'মিছিল' সংখ্যাটি দেশবাসী তথা বাঙালির স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের দিশা। এই প্রতিবাদ নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরের নাগরিক জীবনে ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদ। বঞ্চনা থেকে মুক্তির সন্ধানে আগুয়ান জনসাধারণের লড়াই। কর্পোরেট সেক্টর ও পাবলিক সেক্টরের দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে লড়াই। বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক—সবাইকে নিয়ে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের গণ্ডগোলের বিরুদ্ধে মিছিল অভিযানের অনুপুঙ্খ ধারাভাষ্য কবি জয় গোস্বামীর কলমে যেভাবে উঠে এসেছে, তা প্রশংসনীয়। ২০০৭-এর ১৪ নভেম্বর যে ঐতিহাসিক গণমিছিল কলকাতার রাজপথ অলংকৃত করেছিল, তা 'মিছিল এই পথ দিয়েই যাবে' রচনায় পুনঃস্মরণযোগ্য। রিজওয়ানুরের আত্মবলিদানকে কেন্দ্র করে মোমবাতি জ্বালিয়ে যে মিছিল কলকাতার মানুষ দেখেছে, তা প্রতিটি প্রেমিকহৃদয়কে এক পংক্তিতে বসিয়েছে। রিজওয়ানুর-প্রিয়াঙ্কার মর্মান্তিক পরিণতি স্বাভাবিক বোধবুদ্ধির ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে।

তবে মিছিল মানে 'troop assembled in united action' —এই আভিধানিক সংজ্ঞা সাধারণ উদ্দেশ্যে জমায়েতের সঙ্গে কেমন যেন গুলিয়ে গেল। জমায়েত ও মিছিলের দু'টি ভিন্ন থিম হওয়া কি উচিত?

বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরি উত্তর চব্বিশ পরগনা

গণ অভ্যুত্থান

'মিছিল' সংখ্যার বিষয় নির্বাচনে খুব একটা বিস্মিত হইনি। ক্ষমার অযোগ্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যতিক্রমী প্রতিবাদের সমর্থনে রোববার যে গর্জে উঠবে, তা জানতাম। যদিও মিছিল শব্দটা শুনলেই কেমন যেন শুধু রাজনীতির রহস্যময় জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটা বিষয় বলে মনে হয়। যেটা কোনও রাজনৈতিক দলের কাগজে-

আবার তা যদি তিরিশোর্ধ বছরের ক্ষমতায় থাকা একনায়কতন্ত্রমুখী শাসক দলের হয়, তা হলে তো প্রতিদিনের জীবনের পথচলা বাহুবলে রূপান্তরিত হয় মিছিল পথে। যে অভূতপূর্ব মৌনমিছিলের প্রথম বর্ষপূর্তির সৌজন্যে এই 'মিছিল' সংখ্যা, তা অবশ্যই দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে আছে। কবি জয় গোস্বামী একে এক আশ্চর্য ঐতিহাসিক মিছিল বলেছেন। ইতিহাসের চিরদুর্বল শিক্ষার্থী হয়েও বলতে পারি, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন মহাকাব্যিক মিছিল আর হয়েছে কি না আমার জানা নেই। তাই একে গতানুগতিক মিছিল না বলে মানবিকতার স্বার্থে এক স্বতঃস্ফূর্ত গণ অভ্যুত্থান বলাই উচিত হবে।

দেবাশিস হাজরা হাওড়া

চিঠি পাঠাবার ঠিকানা : লেটারবক্স, **রোববার** সংবাদ প্রতিদিন
২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২
robbar@sangbadpratidin.org
Fax 22127977

কলেজ জীবনে ষাটের কলকাতার কফি হাউসের শীলিত কৌতুকাড্ডার অনেক টুকরো টুকরো মণিমাণিক্য অজান্তে কুড়িয়েছি, প্রায় কলকাতার এক হীরকমণ্ডিত সময়ের প্রতি আগ্রহবশত—কিংবা হয়তো অনেক সময় একটা স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সূত্রে।

আজকের সত্যজিৎ জন্মবার্ষিকী সংখ্যার নামকরণ করতে গিয়ে কেন যেন সেই নামটাই মনে এল।

সত্যজিৎকে 'ঢ্যাঙা' বলে ডাকাটা প্রায় যেন কালজয়ী ভাবে বিখ্যাত করেছিলেন ঋত্বিক ঘটক। এই ঠাট্টার মধ্যে যে কী পরিমাণ অনুরাগ ছিল, সেটা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি ঋত্বিকের নিজের শারীরিক দৈর্ঘ্যর দিকে একনজর তাকালেই।

সুদীর্ঘ সেই মানুষটা যখন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর উচ্চতা দিয়েই কেবলমাত্র তাঁকে সম্ভাষণ করেন, অন্য গুণগুলোকে সযত্নে সংগোপনে আড়াল ক'রে—যে বৈশিষ্ট্য তাঁকে নিজেকে বর্ণনা করার জন্যই অতটাই অমোঘভাবে নির্ভুল, তখন সত্যিই মনে হয় কী নিষ্কলুষ অনাবিল সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাজ করে চলেছেন এই মানুষগুলো।

বুঝি সেই মানুষটার পক্ষেই এত অবলীলায় বানানো সম্ভব একটা 'অযান্ত্রিক'। একটা 'সুবর্ণরেখা'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা সুবিধে ছিল। তাঁর নামটাকে ছোটবড় ভাঙচুর কোনও কিছু করেই অকাব্যিক করা মুশকিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথাটা বলতে যদি না-ও বা চাই, শুধু 'রবীন্দ্রনাথ' শব্দটার মধ্যেই কতটা নির্ভার ওজন আছে—সেটা বাকাবন্ধর গুণ না ইতিহাসের কারসাজি, এখন বলা মুশকিল। কিন্তু অপভ্রংশের নামগুলো যেমন 'রবি ঠাকুর', 'গুরুদেব' এমনকী 'কবিগুরু'—প্রকাশ্যের বা আড়ালের সম্ভাষণের এই বিবিধ নামাবলি কেমন যেন একটা মানুষেরই নানা ডাকনাম, যারা স্বচ্ছন্দে, অতি অনায়াসে লুকিয়ে থাকে তাঁর আগুম্ফলম্বিত জোব্বার পকেটে। আর প্রয়োজন মতো ফুটে বেরিয়ে আসে সব সৌন্দর্য আর সৌরভ নিয়ে—বর্ষার যূথীমালিকা বা বসন্তসমাগমের পলাশের মতো।

কলকাতার শেষ রেনেসাঁ-পুরুষ সত্যজিৎ-ও কেবল স্বাভাবিক গুণেই অনেকগুলো নাম পেয়েছিলেন। গোটা টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রি তাঁকে ডাকত 'মানিকদা' বলে। যতদূর জানি, সেটাই তাঁর ডাকনাম।

তাঁর হীরকখচিত প্রতিভা কখন যে তাঁর ডাকনামটাকেই তাঁর যথার্থ সংক্ষিপ্ত পরিচয় করে দিয়েছিল গোটা ইন্ডাস্ট্রির কাছে, তার সচেতন ইতিহাস আমার অজানা।

এখন, ভাবলে মনে হয়, ভাগ্যিস সত্যজিৎ রায়ের অমন সাধারণ অথচ তাৎপর্যপূর্ণ একটা ডাকনাম ছিল—নইলে কেমন করে ওই দীর্ঘায়তন, গম্ভীরকণ্ঠ, মিতবাক মানুষটির সঙ্গে ভাব জমাত

ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

টালিগঞ্জ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি? তার সঙ্গে কিছু বেনোজলও ঢুকেছিল—অনেককেই শুনি সত্যজিৎ-প্রসঙ্গ এলেই 'মানিকদা' বলে সম্বোধন করতে, পরে জেনেছি, ডাকনামে ডাকার অন্তরঙ্গতা তো বাদই দিলাম, এঁদের সঙ্গে সত্যজিতের প্রায় চাক্ষুষ পরিচয়ও ছিল না। এটা ওই চলমান অশরীরী 'অরণ্যদেব'কে 'বেতাল' করে জনপ্রিয় করে নেওয়াই অনেকটা।

টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রি সত্যজিতের আড্ডাঘর নয়। তিনি স্টুডিওতে যেতেন কাজ করতে, কাজ করে ফিরে আসতেন বাড়ি। সত্যজিতের আড্ডাচক্র প্রধানত তাঁর নিজের বাড়ির বৈঠকখানায়। আর কিছুটা হয়তো যৌবনারম্ভের কফি হাউসে, সিগনেট প্রেস-এর জমায়েতে... ইত্যাদিতে।

সেখান থেকেই শুনেছিলাম, তাঁর এই অদ্ভুত নামকরণ, ওরিয়েন্ট লংম্যান পাবলিকেশনটির সঙ্গে হয়তো বা তখন প্রথম পরিচিত হচ্ছেন কলকাতার মানুষ।

'দ্য টল ম্যান ফ্রম দি ইস্ট' বা 'প্রাচ্যের সেই দীর্ঘ মানুষটি' যিনি তাঁর সমস্ত পাশ্চাত্যতা দিয়ে ততদিনে বাংলার মুখ হয়ে গেছেন পৃথিবীর দরবারে—তাঁকে বন্ধুবান্ধবরা সকৌতুকে নাম দিলেন 'ওরিয়েন্ট লংম্যান'।

শুনে খুব মজা পেয়েছিলাম।

এর পরেই আরেকটি নামকরণ হয়েছিল সত্যজিতের। একই কৌতুকগোষ্ঠী থেকেই বোধকরি।

'ইস্টার্ন বাইপাস' সেটা তাঁর বাইপাস সার্জারি আর ই এম বাইপাস নির্মাণের সন্ধিক্ষণে।

কৌতুকের একটা সর্বনাশা আগ্রাসী আনন্দ আছে। সে জরা, ব্যাধি, মৃত্যুকেও তোয়াক্কা করে না। জানি না, জীবদ্দশায় সত্যজিৎ এই নামকরণটি শুনে গেছেন কি না, হয়তো বা গ্রহণও করেছেন তাঁর স্বভাবোচিত উচ্চকিত কৌতুকহাস্যে, কিন্তু আমার কোথায় যেন একটু খারাপ লেগেছিল।

বিশেষ করে যখন শালপ্রাংশু, সুঠামদেহী সেই মানুষটির প্রতিকৃতিতে শিরাকুঞ্চনের মালিন্য ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে উঠছে তাঁর প্রতিটি জন্মদিন-আলেখ্যে। কেমন করে যেন ভেতর থেকে মনে হত, এই নামটা, ঠাট্টা করে হলেও—না দিলেই হত।

কে জানে হয়তো জড়-সংস্কার কিন্তু সেই সংস্কারই তো প্রতিমা বানায়। মূর্তি নির্মাণ করে।

ঋতুপর্ণ ঘোষ

সংযোজন : আমাদের সাম্প্রতিক সংখ্যা 'উনিশে এপ্রিল'-এর ফার্স্ট পার্সন-এ একটা তথ্যভ্রান্তি আছে। ইতিমধ্যেই কয়েকজন দায়িত্ববান পাঠক সেদিকে নজর আকর্ষণ করা চিঠি পাঠিয়েছেন।

সত্যজিৎ চলে গেছেন ১৯৯২ সালে। আমি লিখেছিলাম ১৯৯১। ভুল লিখেছি, স্বীকার করছি। তবে সত্যজিৎ কবে চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে সেটা মনে রাখার দায়িত্ব আমি ইতিহাসের হাতে ছেড়ে দিলাম।

আমার মন না হয় সে দায়িত্ব না-ই বা নিল। সেটা তো আজীবনের জন্য ওরিয়েন্ট লংম্যান-এর এক অপূর্ব অমরাবতী।

ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

নবনীতা দেবসেন

তিন নম্বর ওয়াটারলু স্ট্রিট

ভেঙে ফেলা হবে। আটকানো গেল না তা হলে? দশ বছর চেষ্টা করে হেরে গেলেন বারীন রায়। ওই পাড়াতে এখন জমির অনেক দাম, অতটা জায়গা অমন ফেলে ছড়িয়ে ব্যবহার করার দিন আর নেই। অতএব, ভাঙলো মিলনমেলা, তিন পুরুষের (তিনজন পুরুষ, ঠিক তিন পুরুষ নয়) ঐতিহ্যময় ঠিকানা এবারে বদলাবে। তিন নম্বর ওয়াটারলু স্ট্রিট, আমি জানতুম, মা-বাবার বন্ধুর বাড়ি। মাঝে মাঝে ওঁরা সেখানে বেড়াতে যেতেন। শৈশবে শুনেছি ওই বাড়ির বন্ধু বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের অসামান্য নৈপুণ্যের কথা, দন্ত চিকিৎসায় তাঁর দৈব দক্ষতা নাকি প্রায় বিধান রায়ের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁকে দেখেছি কি না আমার মনে নেই। তারপরে এসে পড়ল গোপালবাবুর আড্ডার গল্প, কৈশোরে তাঁকে এই চেম্বারে কর্মরত দেখেছি, তিনি ছিলেন বঙ্কিমবাবুর ভাগ্নে। পরে তাঁর সঙ্গে সহকারী চিকিৎসক এলেন এক রূপবান লাজুক তরুণ, তাঁর চেয়ে অনেকটা ছোট ভাই, বঙ্কিমবাবুর আর এক ভাগ্নে, আমাদের আজকের এই আসর জমানো বারীনদা। আমার মা-বাবার পদাঙ্ক আমি আর কোনও ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে পারি বা না পারি, এই একটি ক্ষেত্রে আমি তাঁদের গৃহীত পথ থেকে নড়িনি। বাড়ি থেকে দাঁতের যন্ত্রণা নিয়ে বেরুনো মানেই এই তিন নম্বর ওয়াটারলু স্ট্রিটে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া। গোপাল কাকাবাবু দৃশ্যত গম্ভীর, লম্বা-চওড়া, সাহেবি কেতাদুরস্ত, পুরুষ সিংহ ছিলেন (পরের দিকে আমার বাবার মতো ইয়া এক গোঁফ রেখেছিলেন, আমার মায়ের সেটি খুব পছন্দ হয়েছিল!) কিন্তু আসলে তিনি এক হাসিখুশি আড্ডাবাজ মানুষ। সেই মেজাজ এই বাড়ির বাতাসে ছড়িয়ে থাকে, ডাক্তার, রোগী, সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

আমি যখন ওয়াটারলু স্ট্রিটে দাঁত দেখাতে এলুম তখন আমি মা হয়ে গিয়েছি, বিদেশ থেকে ফিরে দেশে গুছিয়ে বসছি। তখন বারীনদার চেম্বারে আমাদের নাম লেখানো হল। বাচ্চাদের এটা-ওটা নিয়মমাফিক দন্ত চিকিৎসা লাগে। নিজের কঠিন কাজ সরল করতে বারীনদা ডাক্তারি যা করবার তা করতেন ভীতু বালিকাদের যথাসাধ্য গল্পে গল্পে ভুলিয়ে। এখন তো শনিবারটা প্রধানত ছোটদের জন্যে তুলে রাখা।

দাঁতের চিকিৎসা তো নয়, বারীনদার কাছে ওয়াটারলু স্ট্রিটে যাওয়া মানেই যেন একটা সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া। রিসেপশনটি যেন সত্যিই অভ্যর্থনার উষ্ণতায় ভরা, সামাজিকতা, লৌকিকতা, কিঞ্চিৎ পরচর্চা, কুশল সংবাদ চালাচালির ঠাঁই। যাঁরা (অর্থাৎ দাঁতের বেদনায় অস্থির রোগীরা!) ডাক্তারের ঘর থেকে নিজেদের ডাক আসার অপেক্ষায় বসে থাকেন তাঁদের অর্ধেকের সঙ্গে আমার আগে থেকেই নানাভাবে আলাপ, বন্ধুতা, আত্মীয়তা, বিবিধ প্রকারের ঘনিষ্ঠতা আছে। হঠাৎ হঠাৎ চেনা মানুষদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত, গল্প গুজব হত, মেজাজ খুশ হয়ে যেত, কামারাদেরির গুণে দন্ত চিকিৎসার ভয়টা আপনি কমে আসত বসে থাকতে থাকতেই। ডাক্তারের চেম্বার তো নয় যেন জমিদারবাড়ির বড়বাবুর বৈঠকখানা, দ্যাখ না দ্যাখ এমনই আড্ডাচক্র বসে যেত, যে ডাক এলে, গল্পের মাঝপথে আড্ডা ছেড়ে উঠে যেতে মনে একটু কষ্টই হত।

তিন নম্বর ওয়াটারলু স্ট্রিটের প্রসঙ্গে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও

একটি কথা বলেই ফেলি। এই পরিবারের বৈশিষ্ট্য, সবাই নিজের পেশা, শিল্প, এবং মানুষকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে ভালবাসতে পারেন, বারীনদা, বউদি, অচিনদা, বউ-সমেত অমিত, সবাই, একেবারে মুনিয়া অবধি সিধে লাইন টানা। পেশাতে উৎকর্ষ লাভের পাশাপাশি শিক্ষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, চিত্রকলা, নাটক (এমনকী সংবাদপত্র!) সব বিষয়েই তাঁদের আগ্রহ, উৎসাহ, শ্রদ্ধা এবং পরদর্শিতা লক্ষ করে অবাক হয়েছি। সাধে কি আর ওদের বাড়ির দোরের কার্ড এঁকে দেন মকবুল ফিদা হুসেন? তিন নম্বরের ওই বৈঠকখানাতে ছুটির দিনে কত কবিতা পাঠ, গানের আসর, পুস্তক উদ্বোধনের সভা হয়েছে, কত খাওয়াদাওয়া। কলকাতার সঙ্গে রীতিমতো একটা চমকদার অবাণিজ্যিক, অপেশাদারি, সামাজিক, হার্দিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে এই তিন নম্বর। কেউ নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দ্বিমত হবেন না, যদি বলি, যে সারা কলকাতা শহরের তিন কী চার প্রজন্মের সামাজিক 'হুজ হু' হল ওই তিন নম্বর বাড়ির দো'তলার চেম্বারের বিগত সাত দশকের রোগীদের তালিকাটি। কে নেই? কাকে চান? সরকারি হোমরাচোমরা? রাজনীতির মানুষ? বুদ্ধিজীবী? আইনজীবী? অভিনয়ের লোকজন চান? বেশ, মঞ্চের না চলচ্চিত্রের? অ্যাক্টর/ ডিরেক্টর/ প্রোডিউসার/ডিস্ট্রিবিউটর, যাকে চান, সব, সবাইকে পাবেন। সাহিত্যের মানুষ? প্রকাশনার? অধ্যাপনার? শিল্পপতি? সাংবাদিক? ব্যবসায়ি? বক্সওয়ালা চান? খেলোয়াড়? (ক্রিকেট, না ফুটবল? দু'রকমই পাবেন এখানে।) ফোটোগ্রাফার? প্রোমোটার? এঞ্জিনিয়র? স্কুলটিচার? ডাক্তার? (অ্যালোপ্যাথি না হোমিওপ্যাথি, না আয়ুর্বেদ? তিন রকমই পাবেন।) জাদুকর? ভাস্কর? কিংবা চিত্রকর চান? না মডেল চান? সেও পাবেন। শুধু ব্রাহ্ম রোগী পাওয়া একটু কঠিন হবে, কেন না তাঁরা প্রধানত একটি ব্রাহ্মপ্রধান খাস চেম্বারে, চৌরঙ্গীর সাহেব পাড়ায় হাজিরা দিতেন, আরেক দারুন দাঁতের ডাক্তার, এস কে মজুমদারের কাছে, তিনি লীলা মজুমদারের স্বামী। তাই সত্যজিৎ রায় তিন নম্বর বাড়ির তালিকায় না থাকলেও মৃণাল সেন, তপন সিংহরা আছেন। আছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ি সান্যাল, ছায়া দেবী, রবি ঘোষ। সুচিত্রা সেন, মাধবী মুখোপাধ্যায়, অপর্ণা সেনকেও পেয়ে যাবেন, গ্ল্যামারের অভাব নেই। নাটকে শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, উৎপল দত্ত, শোভা সেন ইত্যাদি। এদিকে লেখালিখির দিকে তারাশংকর, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রথমনাথ বিশী থেকে গৌরকিশোর ঘোষ, সুনীল, শীর্ষেন্দু, শংকর, সঞ্জীব। নরেন্দ্র রাধারানী তো নবনীতা, অন্তরা, নন্দনা সমেত তিন প্রজন্মের ভালবাসার বাঁধনে বাঁধা। ওদিকে দুই বিদ্বান অশোক মিত্র, দু'জনেই, অমর্ত্য সেনও বাদ নেই, অমিয় এবং যশোধরা বাগচি, ধৃতিকান্ত ও শীলা লাহিড়ী চৌধুরী, তালিকায় আমার কতজন বন্ধু যে আছেন! এঁদের মুখ মনে পড়ছে, আরও কত মুখ যে এক্ষুনি মনে পড়ছে না। কত জনের কথা শুধু শুনেছি, সবাইকে তো দেখিনি? মোটমাট সোজা ভাষাতে বললে, মারকাটারি সোশাল নেটওয়ার্কিং চান, তো চোখ বুজে তিন নম্বর ওয়াটারলু স্ট্রিটে চলে আসুন। দন্তরুচিকৌমুদী নির্ভাবনায় বিকশিত করুন, শুধু তো দাঁত ব্যথা নয়, এই মরজীবনের অনেক মাথাব্যথা মিটে যায় একবার ওই চেম্বারের আশ্রয়ে ঢুকে পড়লে। কোথায় ভাল শালকর, কোথায় ভাল বিদেশি রান্না, কোথায় ভাল টিউটর, কোথায় গানের জলসা, ছেলের জন্য পাত্রী, মেয়ের জন্য পাত্র, পথের কুকুরের জন্য মমতার আশ্রয়, কপাল ভাল থাকলে রান্নার লোক, ড্রাইভার, রাজমিস্ত্রি—কোনও ভাবনা নেই, তিন নম্বরে কথাটা একবার তুলেই দেখুন। কথাটা ছড়িয়ে দিন, একটা না একটা খবর ঠিক পেয়ে যাবেন। তালিকাটি তো কম নয়?

এই হাত পা বাঁধা পালাবদলের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেই মুশকিল আসান জাদুকরী ঠিকানা যদি চরিত্র বদল করে অন্য যে-কোনও ধনী ব্যবসায়ীর বর্ণ গন্ধহীন বাড়ি হয়ে যায়, তাতে বুঝি কলকাতা শহরের মনোবেদনা হবে না? কলকাতার বুকে খুব মায়া, খুব মমতা, কিন্তু সে কোনও কম্মের নয়। এটাকে তো হেরিটেজ বিল্ডিং করে রাখা উচিত ছিল কলকাতা পৌরসভার! কিছুই না হয় যদি, তবে একটা ফলক লাগিয়ে দিক, বঙ্গসংস্কৃতির দিক থেকে ঐতিহাসিক বাড়ি তো বটে!

এই বাড়ি ভেঙে ফেলার পরে বারীনদা যেখানেই নতুন চেম্বার করুন, আর সেটা যতই ফাটাফাটি হোক, সে হবে তাঁর নিজের তৈরি। হলই বা ভাড়া করা, হলই বা ভাঙাচোরা, এটি ছিল তাঁর গুরুজনদের আশীর্বাদধন্য ভিটে। তিন নম্বর বাড়িটি তার খাড়া সিঁড়ি আর উঁচু ছাদ নিয়ে থাকুক বেঁচে আমাদের মনে, আমাদের স্মরণে।

শুনেছি মৃতদেহ শনাক্ত করতে তার দাঁতের ডাক্তারি কারুকৃতি নাকি সন্ধানীদের খুব সাহায্য করে। (ভগবান না করুন!) ধরুন যদি কলকাতা শহর কোনও দিন সুনামিতে ধ্বংস হয়ে যায়, তার যুগ যুগান্ত বাদেও কিন্তু সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে ভবিষ্যতের প্রত্নবিদেরা মাটি খুঁড়ে এক বিশাল স্বজন-সম্প্রদায়কে একে একে আবিষ্কার করতে পারবেন, বিভিন্ন সময় ধরে যে মানুষগুলি নিজেদের অস্থিমজ্জায় নাম্বার থ্রি ওয়াটারলু স্ট্রিটের পাঞ্জাছাপ বহন করে চলেছিল। এই ভাঙা-গড়ার জীবনে, এই মুক্তিহীন নম্বরতায়, এটুকুই বা মন্দ কী?

২৫. ০৪. ২০০৯
nabaneetadevsen@gmail.com

গোপন খাতায় মহাভারত

পুণ্যিপুকুর থেকে উপনিষদ, ভূতের রাজার কণ্ঠস্বর থেকে অষ্টোত্তর শতনাম, মহানগর থেকে মহাভারত—প্রাচ্যের ছায়ায় সত্যজিৎ পুরাণ।

উজ্জ্বল চক্রবর্তী

তাঁর কাজের ঘরে এলেই আজও আমাদের আঙুলের ছোঁয়া লাগে তাঁরই সেই পিয়ানোর ডালায়। পিয়ানোর গা ঘেঁষে দাঁড়ালেই, ১৬/১৭ বছর আগেও দেখা যেত, দক্ষিণের জানলার পাশে নিজস্ব কালচে-লাল চেয়ারটিতে বসে, আপন মনে কাজ করছেন সত্যজিৎ রায়। কাজ তো নয়—যেন ধ্যান। তাঁর হাতে ফাউন্টেন কলম, কখনও তুলি।

সেই পিয়ানোর পাশেই এখন হাজির স্টিলের এক আলমারি। সেটার কাচের ভিতর সারি সারি সাদা প্যাকেট। তাদের গায়ে ছিমছাম ছাপানো হরফে লেখা বাঙালির আকৈশোর প্রিয় কয়েকটি নাম—'গুপী গাইন বাঘা বাইন', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'অশনি সংকেত', 'জন-অরণ্য', 'আগন্তুক'...। কতবার এ সব নাম দেখেছি বিজলী, পূর্ণ, প্রাচী, মিত্রা, মিনার বা প্রিয়া-র বাইরের দেওয়ালে! বিরাট কাপড়ে মোটা তুলি দিয়ে নামগুলি এঁকে টাঙানো। বুঝতে অসুবিধে নেই, আলমারির সাদা ওই প্যাকেটের সারিতে আছে সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্যের খাতা। তাঁর নিজেরই হাতে লেখা ও আঁকা। লাল কাপড়ে বাঁধানো।

বাক্সের গায়ে লেখা নামগুলোর মধ্যে একটি নাম কখনও দেখিনি কোনও সিনেমা হল-এর দেওয়ালে।

সত্যজিৎ রায়ের 'মহাভারত'!

তার মানে 'মহাভারত'-এর পরিকল্পনা করেছিলেন সত্যজিৎ। লেখালেখিও করেছিলেন। কিন্তু শুটিং শুরু করেননি।

আশ্চর্য! এত দিন ধারণা ছিল, আমাদের সমকালের ভারত নিয়েই বুঝি তিনি আগ্রহী। আমাদের দুর্ভিক্ষ, আমাদের বেকার সমস্যা, আমাদের ধর্মান্ধতা, আমাদের দুর্নীতি, আমাদেরই মেয়েদের মাথা তুলে দাঁড়ানো। যে-ছবিটিতে সবচেয়ে দূরে পিছন ফিরে তিনি তাকিয়েছেন, তার নাম 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী', ১৮৫৭-র বাস্তব রাজনীতি নিয়ে কাহিনি। তার ওপারে, পিছন ফিরে প্রকাশ্যে তাকানো হয়নি তাঁর।

সে ভুল ভেঙে দিল 'মহাভারত'-লেখা ওই খাতা।

সন্দীপ রায়, মানে আমাদের বাবুদার অনুমতি নিয়ে সেই 'মহাভারত' পড়তে চাইলাম একদিন। তাই বলে আসল খাতাটা ছুঁয়ে দেখার দরকারই নেই। স্ক্যানিং-এর যুগ! ওই খাতার প্রতিটি পাতা স্ক্যান করে সিডি করা আছে—কম্পিউটারে খুলে দেখলেই হল! পাতার পর পাতা পড়া যাবে; দরকার হলে পাণ্ডুলিপির অক্ষর এনলার্জ করে নিয়ে।

সিডি চালিয়ে দেখলাম, ওই খাতার প্রতি পাতায় ব্যাসদেবের ভারতবর্ষকে নতুন করে চিনতে চেয়েছেন সত্যজিৎ রায়। স্বয়ম্বর সভায় কেমন গান গেয়ে গুণকীর্তন করা হত পানিপ্রার্থী রাজাদের। কী কী বাদ্যযন্ত্র বাজানো হত যুদ্ধক্ষেত্রে। কুরুক্ষেত্র দর্শনে এসে নিদারুণ কোন সত্য উপলব্ধি করেছিলেন গান্ধারী। পাতার পর পাতা পড়তে পড়তে মনে ফুটে ওঠে 'মহাভারত'-এর অন্য এক রূপরেখা। কিছুটা আধুনিক এই রূপ সসম্ভ্রম, কিন্তু অহেতুক ভক্তিহীন।

অন্তত এটুকু প্রমাণ পাওয়া গেল, প্রাচীন ভারত নিয়ে সত্যজিতের আগ্রহ তাঁর শিল্পীজীবনের শুরু থেকেই। খাতার প্রথম পাতার তারিখ মিলিয়ে দেখলে মনে হয়, ছবি হলে 'মহাভারত' শেষ হত 'অপুর সংসার'-এর আগে। কিংবা একটু পরেই। কারণ, এই খাতারই শেষের দিকে লেখা আছে 'অপুর সংসার'-এর প্রথম দৃশ্যের কিছু সংলাপ। আর একটি পাতায় আঁকা 'দেবী'র বিরাট এক হোর্ডিং-এর নকশা! তার মানে, 'অপুর সংসার' ও 'দেবী' তৈরির সময় সমান তালে, সমান্তরাল চলেছে 'মহাভারত'-এর পরিকল্পনা!

যেহেতু শিল্পীজীবনের শুরুতেই তিনি ফিরতে চেয়েছিলেন প্রাচীন ভারতে, তাই মেনে নিতে পারি, প্রাচীন ভারত ছিল তাঁর ধমনীতে।

রক্তেই যখন ছিল, তখন শুধুই কোনও কাহিনি নয়—ভারতীয় লোকাচার থেকে দর্শনের নানা ধারাও নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত করেছিল তাঁকে। আজ দেখি, চিরকালের ভারত বার বার কীভাবে উঁকি দিয়েছে তাঁর আধুনিক ছবিতেও, হয়তো ছুঁয়ে গিয়েছে পলকের জন্য। তবু চমকে দিয়ে গিয়েছে। যেমন ভূতের রাজার বর!

ভূতের রাজা ক'টা বর দিতে চেয়েছিলেন গুপী-বাঘাকে? তিনটে! বলেছিলেন—

'...ভূতো রাজা খুশি হলে বর দিই

নামাঙ্কন

তিন বর, তিন বর, তিন বর!'

'কঠোপনিষদ্'-এ যমরাজও তুষ্ট হয়েছিলেন নচিকেতার ওপর। ভূতের রাজার মতোই খুশি হয়ে বর দিতে চেয়েছেন! ক'টা বর? তিন!!

যমরাজের বক্তব্য উদ্ধৃত করি 'কঠোপনিষদ্' থেকে। খাঁটি দেবভাষায় নচিকেতাকে তিনি বলেছিলেন

'ত্রীন্ বরান্ বৃণীষব।'

সাদা বাংলায় 'তিনটি বর প্রার্থনা করো।' এই মিল শুধুই কাকতালীয়? নাকি, এভাবেই কোনও দেশের পুরাণ হঠাৎ কথা বলে ওঠে দেশের আধুনিক শিল্পীর মধ্যে দিয়ে?

'কঠোপনিষদ্'-এর সংলাপই কি উপেন্দ্রকিশোরের কলম ছুঁয়ে ফিরে এল সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে?

খুবই স্বাভাবিক। কারণ, উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে পুরাণের যোগ ছিল নিবিড়। পুরাণের বহু গল্প তিনি বাংলায় লিখেছেন ছোটদের জন্য। আর পিতামহের সেই সব লেখা সত্যজিৎ পুনর্মুদ্রিত করেছেন নিজের 'সন্দেশ'-এ। নিজে ছবিও এঁকেছেন।

এমনই কত সাংস্কৃতিক সূত্র ছড়িয়ে থাকে মহৎ শিল্পীদের কাজে। যার মধ্যে দিয়ে নতুন করে কথা বলে দেশের অতীত। আজ খুঁজে নেব তেমনই কয়েকটি সূত্র।

সাংস্কৃতিক সূত্র

সত্যজিতের ছবিতেই সন্ধান করব কয়েকটি সাংস্কৃতিক ইঙ্গিত। এমন সংকেত, যা এক পলক দেখলে বা শুনলেই মনে পড়ে আরও অনেক কিছু: আমাদের জাতিগত স্মৃতি থেকেই। যেমন 'কাপুরুষ'-এ। করুণার (মাধবী) বাড়িতে অমিতাভ (সৌমিত্র) প্রথম ঢোকার মুহূর্তেই আবহে বেজে উঠেছিল নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'র দু'চার কলি—

"'অর্জুন! তুমি অর্জুন!'
'হাহাহাহা হাহাহাহা, বালকের দল,
মা'র কোলে যাও চলে—
নাই ভয়।
অহো, কী অদ্ভুত কৌতুক।'
'অর্জুন! তুমি অর্জুন!'..."

এটুকুই শুনেছিলাম। 'অর্জুন! তুমি অর্জুন!' বলে চিত্রাঙ্গদার হাহাকারের আকস্মিকতা আঘাত করে আমাদের হৃদয়ে। কারণ, এতক্ষণ পেট্রল পাম্প ও গাড়ি রিপেয়ার-এর সমস্যা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত রাখা হয়েছিল দর্শকদের। তাই আমরা প্রস্তুত ছিলাম না এই হাহাকার শোনার জন্য। আমাদের স্মৃতির দ্বার খুলে দেয় বিলাপের এই ঝাপটা।

আসলে গ্রামোফোনে করুণা বাজাচ্ছিল 'চিত্রাঙ্গদা'। বাড়িতে হঠাৎ অতিথি—তাই গান বন্ধ করে দিল সে। আর কোনও কলি তাই শুনিনি। তবু পুরো 'চিত্রাঙ্গদা' মনে আসে আমাদের, বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো। মনে হয়, 'কাপুরুষ'-এর অমিতাভ কি পারবে 'অর্জুন' হয়ে উঠতে? অর্জুনের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার আকস্মিক দেখা যেমন উত্তীর্ণ হয়েছিল অস্থায়ী এক প্রেমে—করুণার সঙ্গে অমিতাভর এই অভাবনীয় দেখাও কি তেমনই এক প্রেমে উন্নীত হবে আবার? সেই কলেজের দিনগুলোর মতোই। হোক না অস্থায়ী—অমিতাভ কি পারবে না 'অর্জুন' হয়ে উঠতে? জীবনে অন্তত একবার?

দর্শকের মনে এই প্রশ্ন সঞ্চারিত করার জন্য সত্যজিৎকে দশ মিনিট ধরে 'চিত্রাঙ্গদা' শোনাতে হয়নি। 'অর্জুন! তুমি অর্জুন!'—এই এক কলিই শুধু স্পষ্ট বেজেছিল। সেটুকুই যথেষ্ট।

'চিত্রাঙ্গদা'র বেলায় যা সত্যি—তা সত্যি হওয়া উচিত অন্যান্য সাংস্কৃতিক সূত্রের বেলাতেও। যেমন, বাংলার মেয়েদের কোনও

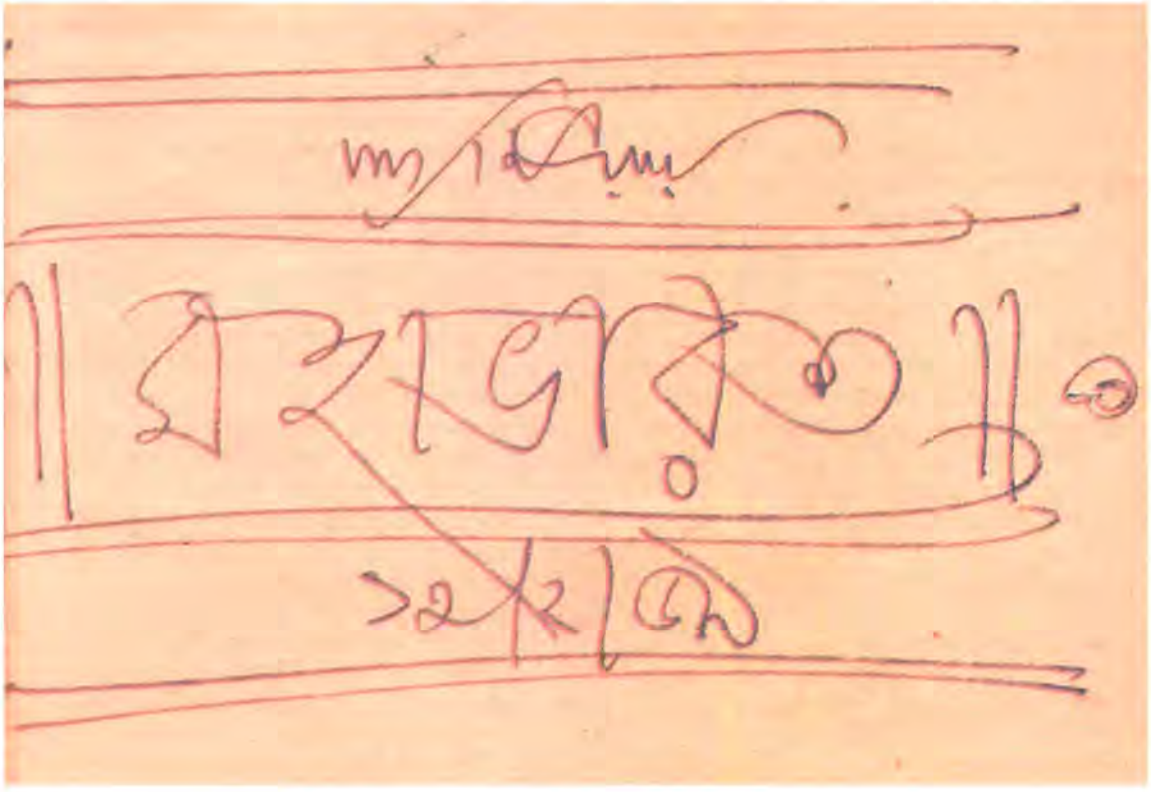

ব্রতকথার একটি পদ শুনলেই বাকিটুকু আমাদের মনে পড়বে না তা কি হয়? 'লক্ষ্মীর পাঁচালী' তো এখনও পড়া হয় ঘরে ঘরে। তা হলে মা লক্ষ্মীর সূত্র এলেই আমাদের মনে আসা উচিত লক্ষ্মীর পাঁচালির নানা প্রসঙ্গ—যেমন, ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের বর্ণনা! 'কষ্টকল্পনা' বলে এই 'মনে আসা'কে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি? যে দর্শকের মনে এ সব স্মৃতি জেগে ওঠে না—তাঁরই জাতিগত স্মৃতি সীমিত। তিনিই হয়তো যথেষ্ট বাঙালি নন।

পুণ্যিপুকুর

এক দুপুরে কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে 'পথের পাঁচালী' ছবিতে। দুর্গা মেঘ আর বৃষ্টি দেখতে যাবে ভাইকে নিয়ে। বৈশাখ মাস। দুপুর-শেষে কালবৈশাখীর মেঘ যতই ঘন হয়ে আসুক, সব ফেলে চট করে দুর্গার বেরনোর জো নেই। কারণ, আগে পুণ্যিপুকুর ব্রত সেরে নিতে হবে বাড়ির উঠোনে। আঙিনার মাটিতে ছোট্ট এক চারকোণা গর্ত কেটেছে দুর্গা। সেটাই পুকুর। 'পুণ্যি পুকুর'! বেলগাছের পাতাশুদ্ধু সরু একটা ডাল পোঁতা পুকুরের মাঝখানে। মন্ত্র আউড়ে সেই গর্তে ঘটি থেকে জল ঢালতে হবে তিনবার। তবে দুর্গার ছুটি। ওদিকে মেঘ এখন আরও ঘন। দিদির অপেক্ষায় একাই মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে অপু। তখন কী মন্ত্র বলল দুর্গা?—

'পুণ্যি পুকুর পুষ্পমালা
কে পুজে রে দুপুর বেলা?
আমি সতী লীলাবতী,
ভাইয়ের বোন—পুত্রবতী।।'

এরকম আরও পদ আউড়ে, নিজেরই কাটা 'পুণ্যি পুকুর'-এ কাঁসার ঘটি থেকে জল ঢালল দুর্গা। তারপর গড় হয়ে পুকুরকে প্রণাম করেই দৌড় দৌড়! মাঠে পৌঁছনোর আগে আর থামা নেই!

দুর্গা যখন গলায় আঁচল দিয়ে খুদে ওই পুকুরের পাশে মাথা নোয়াচ্ছে, দেখেছি তখন অনেক দর্শকের চোখে জল। কেন? তার সহজ একটা কারণ মনে আসে। সকলেই জানি, এই যে দুর্গা আকাশ-ভাঙা মেঘ দেখতে মাঠে বেরবে, সেটাই হবে ওর শেষ বেরনো। আজ ওর জ্বর আসবে বৃষ্টিতে ভিজে। আর সে জ্বর সারবে না। পুণ্যিপুকুর মন্ত্র শুনতে শুনতেই সে কথা মনে আসে। তাই চোখে জল।

আরও কারণ আছে। সেই কারণটা গেঁথে আছে বাঙালি-জাতির স্মৃতির মধ্যে। ঠাকুমা-দিদিমার কোলে দোল খেতে খেতে সেই কারণটা কবে যেন আমরাও জেনে ফেলেছি। জানি, ব্রতকথার মধ্যেই ধরা আছে চিরকেলে বাঙালি মেয়ের ইচ্ছেগুলো। স্বপ্নগুলো। যেমন গুপী-বাঘা যে তিনটে বর চেয়েছে ভূতের রাজার কাছে, ওই তিন বরেই ধরা আছে বাঙালির যত 'চাওয়া'—বাঙালি কী চেয়ে এসেছে এত কাল। মেয়েদের ব্রতকথাও তা-ই।

যারা শুধুই শহুরে, তাদের 'চাওয়া'গুলো আজ অনেকটাই আলাদা। এটাই নিয়ম। তা সত্ত্বেও প্রাণে আজও দোলা দেয় ব্রতকথার পদ। কারণ, ওরা আজও রয়ে গিয়েছে বুকের অতলে।

তাই পুণ্যিপুকুর মন্ত্রের বাকিটুকুও মন দিয়ে শুনি আমরা। ঠাকুমা-দিদিমারা তো শুনবেনই। দ্রুত বলা সেই মন্ত্রের মধ্যেই অনুভব করি—জীবনে আর কী কী চাইত সেকালে দুর্গার মতো মেয়েরা...

'ছয় পুত্র মরবে না
পৃথিবীতে ধরবে না।
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে
মরণ যেন হয় গঙ্গাজলে।।
হে হর-পার্বতী।
দাও মা গো সুমতি।।
আমি অতি হীনমতি।
নাহি জানি স্তবস্তুতি।।
সতী-সাবিত্রী-সীতা।
হই যেন পতিব্রতা।।
মনের সুখে করি ঘর।
দাও মা-গো এই বর।।'

আমাদের মনে ভেসে ওঠে আলো-ছায়া, হাসি-কান্না মেশানো দুর্গার ভবিষ্যতের এক ছবি। যেখানে 'মরণ'-এর কথা যেমন আছে, তেমনই আছে 'সুখে ঘর' করার কথাও। 'কালচারাল এক্সপ্লয়টেশন'-এর পাশেই স্বপ্ন। কী স্বপ্ন? ছ'টি সন্তান হবে দুর্গার। তারা এমন হবে রূপে-গুণে, যে, তাদের রূপ-গুণ ধরার জায়গা থাকবে না গোটা পৃথিবীতেও। ভবিষ্যতের এই আভাস কোন মুহূর্তে আঁকা হল দর্শকের সামনে? জীবনে শেষবারের মতো ভাইয়ের সঙ্গে দুর্গা মাঠে খেলতে বেরনোর ঠিক আগের মুহূর্তে। জীবনে কী কী সে পাবে না—তা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই যেন 'পুণ্যি পুকুর' ব্রত এসেছে 'পথের পাঁচালী'তে।

'পথের পাঁচালী'র এমন এক সূত্র এই ব্রত—বিদেশিরা যার নাগাল পাননি। পাবেনও না। এমনই কোথাও কোথাও 'পথের পাঁচালী' সারা পৃথিবীর হয়েও খাঁটি বাঙালির।

মা লক্ষ্মীর পাঁচালি

মা লক্ষ্মীর বাঁধানো একটি ছবি আছে 'অশনি সংকেত'-এ। ঠাকুমারও মায়ের আমল থেকে এই ছবি বাঙালির চেনা। ১৯৪০ থেকে '৬০-এর দশকে এই ছবিটাই দেখা যেত ঘরে ঘরে। 'অশনি সংকেত'-এ আছে ব্রাহ্মণীর ঠাকুরের সিংহাসনে। অর্থাৎ, নিখুঁত ডিটেল। কিন্তু শুধু কি সেজন্যই এসেছে মা লক্ষ্মীর ছবি? '৪০ দশকের বিশেষ এক স্মারকচিহ্ন রূপে?

না, তা কিন্তু মনে হয়নি। মা লক্ষ্মীর ছবি এসেছে সিনেমার এমন এক মুহূর্তে, যখন ডিটেল খুঁটিয়ে দেখার ইচ্ছেই হয় না। তবু কেন এলেন মা লক্ষ্মী?

ঘটনাটা তা হলে মনে করি? ঠিক কোন ঘটনার পর এসেছিল মা লক্ষ্মীর বাঁধানো ওই ছবি?

...সোহাগ করে গাঁয়ের মেয়েরা ব্রাহ্মণীকে ডাকে 'বামুনদিদি'। ভাদ্র মাস। ১৯৪৩। চাল মিলছে না বাজারে। বামুনদিদিকে নিয়ে গাঁয়ের মেয়েরা জঙ্গলে এসেছে 'মেটে আলু' তুলতে। মাটির নীচে কচুর মতো বেড়ে ওঠে অদ্ভুত এই আলু।

শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ে মেটে আলু বের করছে মেয়েরা। ওদিকে, ঘন গাছপালার আড়ালে গুঁড়ি মেরে অপেক্ষা করছে খাকি পোশাক পরা একজন; তার শার্টের কাঁধে দু'টি ফ্ল্যাপ। সে এসেছে শহর থেকে।

মেয়েরা যেই মেটে আলু কাঁধে তুলে নিয়েছে, অমনি আকাশ কাঁপিয়ে উড়ে এল একসারি যুদ্ধবিমান। কান ফাটানো আওয়াজে চাপা পড়ে গেল মেয়েদের হাসি-ঠাট্টা।

সেই ফাঁকে ঝোপ থেকে বেরিয়ে লোকটা লাফিয়ে পড়েছে বামুনদিদির ওপর। মুখ চেপে ধরেছে থাবার মতো তালু দিয়ে। বামুনদিদিকে নিয়ে চলেছে লজ্জাহরণের শেষ সীমায়!

নিজের মুখটা হঠাৎ ছাড়িয়ে নিয়েই বামুনদিদির আর্ত চিৎকার! সখীরা দৌড়ে এসে লোকটার মাথায় শাবলের বাড়ি মেরে, চাঁদি ফাটিয়ে, রক্তের ধারা বইয়ে, উদ্ধার করল বামুনদিদিকে।

বাড়ি ফিরেছে বামুনদিদি। শাড়ি জুড়ে শুকনো কাদা। কেশ-বেশ আলুথালু। ঘরে ঢুকেই দরজা ভেজিয়ে, পাল্লায় ভর দিয়ে দাঁড়াল বামুনদিদি। প্রচণ্ড হাঁপাচ্ছে। প্রথমেই ওর দৃষ্টি গেল মা লক্ষ্মীর বাঁধানো ছবির দিকে। আমাদের বুক মুচড়ে ওঠে তক্ষুনি। কেন? কেন বামুনদিদির এখনই মনে পড়ল মা লক্ষ্মীর কথা?

বামুনদিদিকে বৃদ্ধ দীনু ভট্টাচার্য ডেকেছিলেন 'মা লক্ষ্মী' বলে। তিনিই গৃহলক্ষ্মী। গৃহের ধারক। সমাজেরও। এমনই এক নারীর

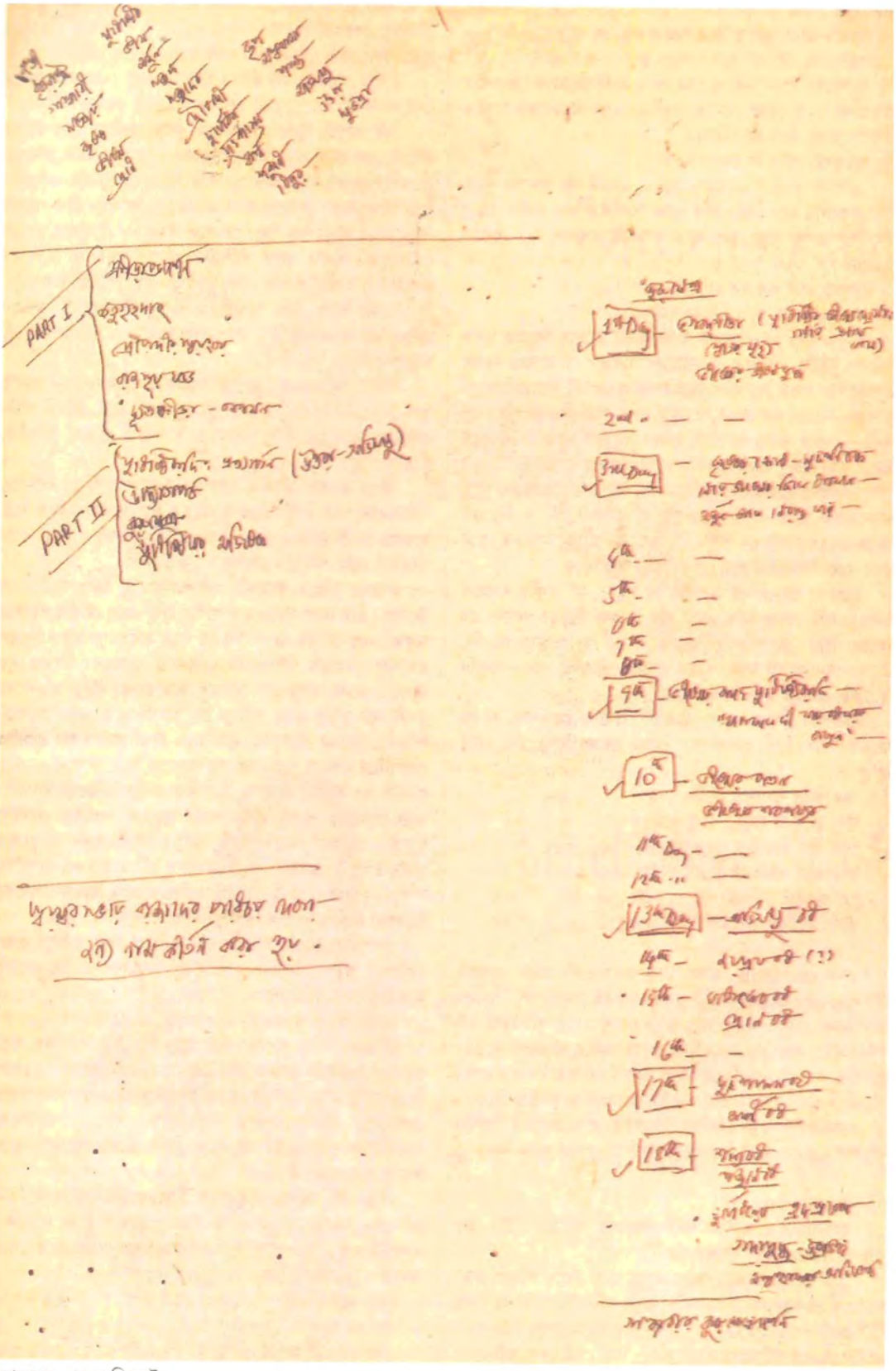

বর্ণনা পাই লক্ষ্মীর ব্রতকথায়।

'লক্ষ্মী-অংশে নারীজাতি করিয়া সৃজন
পাঠায়েছি মর্তধামে সুখের কারণ ॥'

আমাদের 'বামুনদিদি'-ও যেন এই মা লক্ষ্মীরই অংশ। নিজেকে বামুনদিদি তা-ই ভেবে এসেছে এতদিন। এখন কি নিজের সামনে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে নিজেরই প্রতিমা?

গৃহলক্ষ্মী এবার কি চঞ্চলা হবেন?

এখানেই লক্ষ্মীর ব্রতকথার আরও একটি পদ গুনগুন করে ওঠে বাঙালির মনে। পদে বলা হচ্ছে 'অপবিত্র' এক নারীর কথা। বামুনদিদিও কি আজ ভুল করে তেমনই একজন মনে করছে নিজেকে?

'লজ্জা আদি গুণ যত নারীর ভূষণ।
আপনার হতে তারা করেছে বর্জন ॥'

বামুনদিদিও কি লজ্জাকে আজ বর্জন করেছে নিজের হৃদয় থেকে? নইলে, কী করে সে 'শ্রীহীনা' অবস্থায় পা রাখতে পারল নিজের ঘরে? তার ঠাকুমারও ঠাকুমার কাল থেকেই গাঁয়ের মেয়েরা ভাবত—নিজের মন থেকে সহজেই লজ্জা মুছে ফেলতে পারে যে নারী—সংসার ভাঙে তাদেরই জন্য। তাদেরই একজন কি হয়ে উঠবে বামুনদিদি? তারই জন্য কি লক্ষ্মী পালিয়ে যাবেন গাঁ ছেড়ে? 'আমারই জন্য দুর্ভিক্ষ কবলিত হবেন আমার স্বামী? আমাদের গাঁ?' বামুনদিদির পক্ষে এ কথা ভাবাই স্বাভাবিক। সে যে নিতান্তই আক্রান্ত—এ ভাবনা সে বিকেলেই তার মনে আসার কথা নয়। স্নান করে 'শুদ্ধ' হওয়ার আশায় সে দৌড়য় নদীর দিকে।

লাঞ্ছিতা বামুনদিদির অশ্রুপাতের মুহূর্তে, মা লক্ষ্মীর বাঁধানো ছবির একটি ক্লোজ-আপ এমন কত ভাবনা উড়িয়ে আনে। যে মায়েরা প্রতি বৃহস্পতিবার আজও পড়েন মা লক্ষ্মীর পাঁচালি, তাঁদের অনায়াসেই মনে পড়বে লক্ষ্মীর পাঁচালির পদ—'অশনি সংকেত'-এর এই দৃশ্য দেখার সময়।

দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গে মনে আসবেই লক্ষ্মীর ব্রতকথার আরও কয়েকটি পদ। লক্ষ্মী চঞ্চলা হলে কেমন মন্বন্তর দেখা দেয়, তারই বর্ণনা :—

'অন্নাভাবে শীর্ণকায় বলহীন দেহ।
ক্ষুধা কষ্টে আত্মহত্যা করিতেছে কেহ ॥
কেহ প্রিয় প্রাণাধিক পুত্রকন্যাগণে।
করিতেছে পরিত্যাগ অন্নের কারণে ॥
বল বল বল দেবী কী পাপের ফলে।
ভীষণ দুর্ভিক্ষে সদা মর্ত্যবাসী জ্বলে ॥....'

কোন ছেলেবেলায়, আজ থেকে অর্ধ শতাব্দী আগে, বাবারও দিদিমার মুখে শুনেছি লক্ষ্মীর ব্রতকথার এই সমস্ত পদ। তিনিও শুনেছিলেন তারও আশি বছর আগে। তার মানে, দুর্ভিক্ষের এই বর্ণনা গ্রামীণ বাঙালির রক্তে মিশে আছে লক্ষ্মীর পাঁচালির সূত্রেই। এ বর্ণনা তাদেরই মনে ফিরে আসে 'অশনি সংকেত' দেখতে বসে। বামুনদিদি যখন দু'চোখ ভরা জল নিয়ে তাকায় মা লক্ষ্মীর দিকে।

বাঙালির নিজস্ব লৌকিক বিশ্বাসের এক চালচিত্র 'অশনি সংকেত'। এ আমাদের নিজস্ব। ভিনদেশিরা নাগাল পাবে কি?

শ্রীকৃষ্ণের ১০৮ নাম

'অপরাজিত'য় কাশীর ঘাটে কথকতা করছেন প্রৌঢ় এক পণ্ডিত। বলছেন রাধা-কৃষ্ণের গল্প :

"...দেখেছ? কেষ্টার বুকের ওপর মাথা রেখে আবার কান্না হচ্ছে! দাঁড়া, দাদাকে ডেকে আনি। তখন জটিলা করলেন কী, ধীরে ধীরে আয়ানের নিকট গমন করিলেন। আয়ানকে ডেকে নিয়ে তখন এলেন, এসে আড়াল থেকে বললেন—'দাদা! ওই দেখ! ওই দেখ! তোমার বউয়ের কাণ্ডখানা দেখ! কেষ্টার বুকে মাথা রেখে কাঁদছে!' তখন কৃষ্ণ করলেন কী, বললেন—'রাধা, তুমি জবাফুল আমার পাদপদ্মে অর্পণ করো। আমি এবার কালীমূর্তি ধারণ করি আয়ানকে সন্তুষ্ট করার জন্য! তখন কৃষ্ণ কালী হলেন।..."

এ ঘাট থেকে ও ঘাট হাঁটতে হাঁটতে, একটু থেমে অপু শুনছে সেই কথকতা। হয়তো সেই প্রথম শুনছে রাধা-কৃষ্ণের কাহিনি।

সেই অপুরই মুখের দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে, ওর বিয়ের আগেই ওর ভাবী বধূর মা বলেছিলেন—'এ মুখ আমি কোথায় দেখেছি? না-না, এ আমার খুব পরিচিত মুখ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, দেখেছি! পটে আঁকা ঠাকুর দেবতার মুখ। অনেকবার দেখেছি!' ঠিক পাশেই দাঁড়িয়েছিল অপুর বন্ধু পুলু। সে বলে উঠল —'একেবারে সাক্ষাৎ কেষ্টঠাকুর। আবার হাতে বাঁশিটিও আছে!' বধূর মা আশীর্বাদ করলেন—'আশীর্বাদ করি—দীর্ঘজীবী হও বাবা, দীর্ঘজীবী হও।'

বিয়ের পরও বাঁশি বাজিয়েছে অপু। রবীন্দ্রনাথের বসন্তের গান—'যদি তারে নাই চিনি গো সে কি আমায় নেবে চিনে/এই নব ফাল্গুনের দিনে...

বাঁশি হাতে অপুকে দেখে কৃষ্ণের কথা আমাদের মনে আসাই স্বাভাবিক। তবে স্ত্রীর মৃত্যুর পর অপুকে আর দেখিনি বাঁশি বাজাতে। মনে হয়, বাঁশি বাজানোর কারণটাই হারিয়ে গিয়েছিল জীবন থেকে।

'অপুর সংসার'-এ বাঁশি এসেছিল অপুকে আশীর্বাদ জানিয়ে, কিছুটা যেন তার গুণকীর্তনের জন্যই আমাদের অবাক করে দিয়ে 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি'-তেও শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন একই কারণে। নবাব ওয়াজিদ্ আলি শাহ্-কে প্রশস্তির লক্ষে।

নবাবের চরিত্রে কয়েকটি গুণ আবিষ্কারই ছিল সত্যজিতের উদ্দেশ্য। তার মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় গুণ—গান লেখার সহজাত ক্ষমতা। শুধু লেখাই নয়— নিজের গানে শ্রুতিমধুর সুরও দিতেন ওয়াজিদ। স্বরচিত গীতিনাট্যে অভিনয়ও করতেন। নিজের সুর দেওয়া গানের তালে পা মিলিয়ে নাচতেনও। তাঁর অভিনয়ের একটি মাত্র দৃশ্যই আছে 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি'-তে। নবাব সেখানে অভিনয় করছেন শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায়। রাসলীলার দৃশ্য। নৃত্যরত গোপিনীরা ঘাগরায় ঘুরনি তুলেছে নবাবকে ঘিরে! লখনৌ-ঘরানার কমনীয় কত্থক। নবাবই আজ শ্রীরাধিকা ও গোপিনীদের মধ্যমণি। ময়ূর-পেখমের পালক বাঁকা করে লাগানো নবাবের সোনালি মুকুটে। ঠোঁটের কোণে স্মিত হাসি। নবাব এখন শ্রীকৃষ্ণের 'আর্কেটাইপ'। এখানেই বিস্ময়! নবাবের চরিত্রে ইংরেজ-সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কিছু উপাদান আবিষ্কার করাই ছিল সত্যজিতের উদ্দেশ্য। তিনি যাতে বিশুদ্ধ ভারতীয় হয়ে ওঠেন।

দেশীয়-সংস্কৃতির প্রতিনিধিরূপে নবাবকে দেখাতে গিয়ে কৃষ্ণ-পুরাণেরই আশ্রয় নিলেন পরিচালক। কৃষ্ণ-মিথ্-এ কি এতটাই আগ্রহী ছিলেন পরিচালক?

জবাব আছে 'আগন্তুক'-এ।

জীবনের শেষ ছবিতে এসে কৃষ্ণ-মিথকেই সত্যজিৎ করে তুললেন আমাদের দেশের প্রতিনিধি। সাড়ে তিন দশক পর দেশে ফিরেছেন মনোমোহন মিত্র। নৃতত্ত্ববিদ। উঠেছেন দক্ষিণ কলকাতার রোল্যান্ড রোডে ভাগ্নী অনিলার বাড়ি। আত্মীয়রা ভেবেছিলেন—নিশ্চয়ই এত দিনে তিনি ভীষণ সাহেব—ভুলে গিয়েছেন কথ্য বাংলা।

কিন্তু কই, সত্যিই ভুলেছেন কি? ভাগ্নীর ছেলেকে তিনি ডাকলেন 'কৃষ্ণের সারথি' বলে। কারণ ছেলেটির নাম 'সাত্যকি'। এখানেই শেষ নয়। শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের চরণ গেয়ে শুনিয়েও দিলেন নাতিকে :

'হরি-হরায় নমো কৃষ্ণ যাদবায় নমো।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমো ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন ॥'

সাতকাজে
ক্যানভাসে
#28301
Rs 248/-
#28202
Rs 395/-
Sreeleathers
KANVAZ
লেটেস্ট ওয়ার্ল্ড ফ্যাশনের
আসলি চেহারা
সব বয়সের মানুষের জন্য, সব occasion এর জন্য
এক নতুন style mantra। দাম পুরোপুরি হাতের মধ্যেই।
Genesis 2634
Lindsay Street (033)22861510/11
Free School Street (033)22861506
Sreeleathers
বিশ্বমান। খাঁটি দাম।

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম গাইতে পারাটাই যেন মনোমোহনের ভারতীয়ত্বের প্রধানতম প্রমাণ। সেই মুহূর্তেই কৃষ্ণ-মিথ সম্মানীয় একটি স্থান পেয়ে গেল সত্যজিতের ছবিতে। যে সত্যজিৎ ধর্মীয় আবেগকে কোনওদিন সমর্থন করেননি, ধর্মান্ধতার প্রতিবাদে সৃষ্টি করেছেন 'দেবী' থেকে 'গণশত্রু' পর্যন্ত পাঁচটি ছবি—সেই তিনিই শ্রীকৃষ্ণকে মর্যাদার এই আসন দিলেন নিজের ছবিতে। যেন মনে হয়, কৃষ্ণ-পুরাণের স্থান হয়তো ধর্মেরও উর্ধ্বে বলেই মনে করতেন তিনি। সেটাই স্বাভাবিক। পুরাণ ধর্মের উর্ধ্বেই থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম না মেনেও অনেকেই আনন্দ পাই পুরাণ পড়ে। (যেমন ব্রাহ্ম হয়েও উপেন্দ্রকিশোর লিখতেন পুরাণের গল্প।)

শুধু তাই-ই নয়, 'আগন্তুক'-এ মূল চরিত্রের নামের অর্থই হল 'কৃষ্ণ'। এমনকী, এক জায়গায় নিজের সঙ্গে সরাসরি কৃষ্ণের তুলনাও করেছেন মনোমোহন। কীভাবে?

মনোমোহন কবে আবার অরণ্যে ফিরে গেলেন আদিবাসীদের সান্নিধ্যে—এ কথা জানতে ব্যারিস্টার পৃথ্বীশ (ধৃতিমান) সেনগুপ্ত যখন অধৈর্য, তখনই মনোমোহন গেয়ে ওঠেন :—

'রাই ধৈর্যং, রহু ধৈর্যং
মম গচ্ছং মথুরায়...'

এ তো নিজের সঙ্গে কৃষ্ণেরই তুলনা।

'রাই ধৈর্যং' শোনার সময়ই টের পাই, শুরুতেই কেন শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম গেয়েছিলেন মনোমোহন। একশো আটের মধ্যে কী নামে শ্রীকৃষ্ণকে চিনব, তা কি সহজে ঠিক করা যায়? তেমনই, 'আগন্তুক'-এ কোন পরিচয়ে মনোমোহনকে বুঝব, জানব—সেই সিদ্ধান্ত নেওয়াও কি সহজ?

প্রতিভাবান মানুষের পরিচয়ের বৈচিত্র্য বোঝাতেই শ্রীকৃষ্ণের ১০৮ নামের আশ্রয় নিয়েছেন সত্যজিৎ। এখানে সাধারণ মানুষকে তিনি তুলে এনেছেন 'মিথ'-এর স্তরে। তুলে এনেছেন নিজেকেও। কারণ, 'আগন্তুক'-এ মনোমোহনই ছিলেন সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভূ। সুতরাং, মনোমোহনকে কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করা মানে নিজের মধ্যেও কৃষ্ণের প্রতিরূপ সন্ধান করা। নিজের কোন দিকটার মধ্যে? বহুমুখিতার মধ্যে। নিজের অবোধ্য দিকগুলোর মধ্যে। যেখানে একই উপবনে অনেক সত্যজিতের ফুল ফুটেছে। নানা রঙের ফুল। সেখানেই কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর নিজের তুলনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

খ্রিস্টিয় ধর্মসংগীত বাজানো হয়েছে 'শাখা-প্রশাখা'য়। গভীর গম্ভীর সেই কোরাসের নাম 'গ্রেগোরিয়ান চান্ট'। মাঝ রাতে এই ধর্মসংগীত বাজিয়ে শুনছিল প্রশান্ত (সৌমিত্র)—হৃদরোগে আক্রান্ত আনন্দমোহন মজুমদারের মেজ ছেলে। যার মস্তিষ্কে আঘাত লেগেছে গাড়ি দুর্ঘটনায়, বিলেতে পড়তে গিয়ে। এখন আর জীবিকার জন্য কাজকর্ম করতে পারে না প্রশান্ত। মানুষে মানুষে প্রবল প্রতিযোগিতাও তার পছন্দ নয়। সে ক্লান্ত বোধ করে। শুধুমাত্র পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতের আশ্রয়েই সান্ত্বনা পায় প্রশান্ত। শান্তি পায় খ্রিস্টিয় ধর্মসংগীতে। এখানে প্রশ্ন—প্রাচ্য দার্শনিকদের কোনও স্পর্শই কি নেই এই পরিবারে?

এই প্রশ্নের জবাব আমরা পেয়ে যাই 'শাখা-প্রশাখা'-র শেষ দৃশ্যে, শেষ সংলাপে। এখানে সরাসরি উদ্ধৃত হয়েছে উপনিষদ্।

দৃশ্যটি এরকম প্রশান্তর চার ভাই কলকাতার উদ্দেশে সবে রওনা হল সপরিবারে।

শয্যাশায়ী বাবা এখন একা। এবার প্রশান্ত এসে ঢুকল বাবার ঘরে। মস্তিষ্কে আঘাত পাওয়া ছেলের হাতটা নিজের হৃদপিণ্ডের ওপর চেপে ধরলেন অসুস্থ আনন্দমোহন। বললেন—'তুই আমার সব রে প্রশান্ত, তুই আমার সব—শান্তি, শান্তি, শান্তি...'

কখন 'শান্তি' উচ্চারিত হয় পর পর তিনবার? উপনিষদের শান্তিপাঠে। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় কঠোপনিষদ্-এর 'শান্তিপাঠ' থেকে শেষ দু'টি চরণ মনে করি।

তেজস্বী নাবধীতমস্তু. মা বিদ্বিষাবহৈ
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

সরল বাংলায় এই মন্ত্রের মানেটা দাঁড়ায় এরকম
'আমাদের অধীত বিদ্যা তাৎপর্যমণ্ডিত হোক।
যেন আমরা বিদ্বেষভাবাপন্ন না হই পরস্পরের প্রতি।
বিনাশ হোক সকল বিঘ্নের।'

অসুস্থ আনন্দমোহন যখন তিনবার 'শান্তি' উচ্চারণ করেন—উপনিষদের শান্তিপাঠ মনে পড়ে আমাদের। কারণ, উপর্যুপরি তিনবার উচ্চারিত 'শান্তি' মিশে আছে ভারতীয় সংস্কৃতিতে। আমাদের জাতিগত স্মৃতি থেকে মুছে দিতে পারি না এই উচ্চারণ। কোনও উপনিষদ পড়ার দরকারই পড়ে না এর জন্য। পুজো-পার্বণে এই 'ত্রিশান্তি' আমাদের কানে আসবেই। শুনেছি শৈশব থেকেই, তাই ত্রিশান্তি আমাদের ভোলার কথাও নয়।

এবার দেখি, তিনবার 'শান্তি' উচ্চারণ করে বৃদ্ধ আনন্দমোহন কীসের ইঙ্গিত করেছিলেন প্রিয় পুত্র প্রশান্তকে? পুত্রের প্রতি কোন আশীর্বাদ এই ত্রিশান্তি?

উপনিষদ্ অনুসারে, প্রথম 'শান্তি' ব্যাধির বিরুদ্ধে। ব্যাধি যেন জ্ঞানের পথে অন্তরায় না হয়—তারই আশীর্বাদ।

দ্বিতীয় 'শান্তি' হিংস্র শ্বাপদের মতো আচরণের বিরুদ্ধে। পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ যেন বাধা না হয় সত্য অনুভবের পথে।

তৃতীয় 'শান্তি' প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে। দুর্ঘটনা যেন জ্ঞান অর্জনের পথে বাধা না হয়।

জীবনে এই তিন চরম আঘাতের বিরুদ্ধেই শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করলেন আনন্দমোহন। শুভকামনা ও আশীর্বাদের গণ্ডি কেটে দিলেন প্রিয় সন্তানকে ঘিরে

কিন্তু এই 'ত্রিশান্তি' কেন প্রাসঙ্গিক শাখা-প্রশাখা'য়?

ব্যাধি, বিদ্বেষ ও দুর্ঘটনাই শাখা-প্রশাখা'র যাবতীয় ট্র্যাজেডির মূলে—এ কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন কি আদৌ আছে? বাবার ব্যাধি, ভাইয়ে-ভাইয়ে বিদ্বেষ, মেজ ভাইয়ের দুর্ঘটনা—এই তিনটি ঘটনাই 'শাখা-প্রশাখা'র ভিত্তি

সরাসরি উপনিষদ্ উদ্ধৃত করে এই তিন ট্র্যাজেডির বিরুদ্ধে আশীর্বাদ ও প্রতিরোধ—দুই-ই করা হল ছবির প্রধান চরিত্রের পক্ষ থেকে। পরিচালকের পক্ষ থেকেও।

জীবনের শেষ প্রান্তে সত্যিই একটু যেন উপনিষদ্ নির্ভর হয়ে উঠলেন সত্যজিৎ রায়।

'রাধা-কৃষ্ণ' থেকে 'ফর্ম ও কনটেন্ট'

এতক্ষণ আলোচনা সীমায়িত রেখেছি শুধুই সত্যজিতের নানা ছবির মধ্যে। এবার সৃষ্টি থেকে চলে আসা উচিত তাঁর জীবনে। ভারতীয় জীবনদৃষ্টির প্রভাব তাঁর স্রষ্টাজীবনে কত গভীর—তা বোঝাই যাবে না, যদি না তাঁর জীবনে প্রবেশ করি।

সারা জীবন বারংবার নতুন জগতের কাহিনি নিয়ে ছবি করেছেন সত্যজিৎ। তাঁর মধ্যে ছিল অধৈর্য এক ছটফটানি, নতুন বিষয়-ভাবনার জন্য। তলিয়ে না-ভেবেও এই ছটফটানি আমরা টের পাই তাঁর যে-কোনও তিন-চারটি ছবির কথা মনে করলেই। যেমন, 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর সঙ্গে 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র কোনও সাদৃশ্য আছে কি? গল্পে? সামাজিক ভাবনায়? গল্প বলার কৌশলে (অর্থাৎ, কথন-শৈলিতে)? না, কণামাত্র সাদৃশ্য নেই! 'গুপী গাইন' দ্রুতলয়ে বাঁধা, উদ্দীপনায় ভরা। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' বিষাদমগ্ন—কাহিনি উন্মোচিত হয়েছে বিলম্বিত লয়ে। অথচ, 'গুপী গাইন'-এর ঠিক পরের ছবিই 'অরণ্যের দিনরাত্রি'! মেজাজের এমন পরিবর্তন কী করে সম্ভব?

আবার 'সোনার কেল্লা'র ঠিক পরেই তিনি সৃষ্টি করেছিলেন 'জন-অরণ্য'। 'সোনার কেল্লা'র সেই আনন্দময় উচ্ছ্বাস 'জন-

'অশনি সংকেত' সিনেমার শুটিংয়ে

অরণ্য'য় আছে কি? নেই। থাকার কথাও নয়। কারণ, কীভাবে এক উজ্জ্বল তরুণ অন্ধকার জগতে ডুবতে শুরু করল—তাই নিয়েই 'জন-অরণ্য'। সুতরাং, 'জন-অরণ্য' করতে গিয়ে, নতুন এক ফর্ম-এর সন্ধান করতে হয়েছে সত্যজিৎ রায়কে। কারণ, 'সোনার কেল্লা'র চিত্রনাট্যে যে-ভাবে গল্প বলা হয়েছিল, সেই কথন-কৌশল 'জন অরণ্য'য় মানানসই নয়।

সত্যি বলতে কী, নিজের ছবির ফর্ম আর কোনও বিশ্রুত পরিচালকই এত বার পাল্টাননি। চ্যাপলিন, কুরোসাওয়া, বার্গম্যান—কেউই না। সুতরাং, যত বার সত্যজিৎকে নতুন 'কথন-শৈলি' আবিষ্কার করতে হয়েছে, ততবার করতে হয়নি ওঁদের কারও।

মাত্র চারটি ছবির দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা গেল, নতুন ধরনের ভাবনা, বা নতুন ধরনের কাহিনির সঙ্গে সঙ্গে, নতুন নতুন ফর্মেরও নিত্যসন্ধান করতে হয়েছে সত্যজিৎকে। নানা নতুন কথন-শৈলি আবিষ্কার করতে না পারলে, তাঁর বিচিত্র নতুন ভাবনা একা-একাই কেঁদে মরত। প্রকাশের পথই পেত না। ফর্ম আছে বলেই কনটেন্ট আছে। ছায়া আছে বলেই আলো আছে। মৃত্যু আছে বলেই জীবন।

এখানেই মনে পড়ে ভারতীয় পুরাণের 'রাধা-কৃষ্ণ'-র কথা! কীভাবে?

রসশাস্ত্রে রাধা-কৃষ্ণের সম্পর্কটাই যেন ফর্ম ও কনটেন্ট-এর মতো পরস্পর নির্ভরশীল। কাহিনি ও কথন-শৈলির পারস্পরিক নির্ভরতার মতো। অর্থাৎ, নানা 'কথন-কৌশল' আছে বলেই 'কৃষ্ণ' প্রকাশিত। 'নারী' আছে বলেই 'পুরুষ'। পদার্থবিজ্ঞানের 'কোয়ান্টাম' শাখাতেও পেয়েছি সমজাতীয় সূত্র। পরমাণুর অন্তরে যে কোনও মৌল কণারও দুই রূপ—তরঙ্গ ও কণিকা। তরঙ্গ না থাকলে কণিকা অস্তিত্বহীন। বলতে পারি, কৃষ্ণই তরঙ্গ। রাধা হলেন কণিকা।

বৈষ্ণব দৃষ্টিতে 'কৃষ্ণ' হলেন অর্থ বা কাহিনি; কিংবা তাৎপর্য। 'রাধা' হলেন 'ফর্ম', অর্থাৎ 'কথন-কৌশল'। তাই রাধা না থাকলে কৃষ্ণ হয়ে পড়তেন 'ফর্ম'-হীন। প্রকাশ-হীন। তখন কৃষ্ণেরও মূল্যবান কোনও স্থানই থাকত না পুরাণে।

এই সূত্র থেকে আরও একটু এক্সট্রাপোলেট করলে ক্ষতি কী? যে শিল্পী যতবার নিজের 'কনটেন্ট' পাল্টেছেন, ততবারই তাঁকে উদ্ভাবন করতে হয়েছে নতুন নতুন 'ফর্ম'। অর্থাৎ, বারবার তাঁকে খুঁজে নিতে হয়েছে নতুন শ্রীরাধা। (যেমন, আধা-বাস্তব থেকে 'কিউবিজম'-এ এসেছিলেন পিকাসো। 'কিউবিজম' ছিল পিকাসো'র নতুন শ্রীরাধা।)

বৈষ্ণব রসতত্ত্বের দু'টি উপাদান—আশ্রয় আর বিষয়। শ্রীরাধা হলেন 'আশ্রয়'। শ্রীকৃষ্ণ 'বিষয়'। রাধা হলেন 'আধার'। শ্রীকৃষ্ণ 'আধেয়'।

এদিক দিয়ে এক্সট্রাপোলেট করলে, সত্যজিতের সারা শিল্পীজীবনটাই নিত্যনতুন শ্রীরাধা অর্থাৎ নিত্যনতুন 'ফর্ম'-এর অনুসন্ধান। তিনি যদি নিজে কখনও একাত্মবোধ করে থাকেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ('অপুর সংসার'-এর অপু কিংবা 'আগন্তুক'-এর মনোমোহন), তা হলে তাঁর জীবনটাই অসম্পূর্ণ রয়ে যেত, নানা রূপে 'শ্রীরাধা'র সন্ধান না পেলে। দু'য়ে মিলেই সম্পূর্ণতা। ঠিক যেমন শুনেছি 'শুক-শারী' কথোপকথনে :—

'শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
শারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ—
নইলে শুধুই মদন।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
শারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল—
নইলে পারবে কেন?'

শ্রীকৃষ্ণ-রূপী সত্যজিৎ বারংবার 'গিরি' তুলে ধরার মতো অসাধ্যকঠিন কাজ করেছিলেন। শক্তি জুগিয়েছিলেন শ্রীরাধা-রূপী কথন-শৈলি। অর্থাৎ 'ফর্ম' চলচ্চিত্রের নতুন নতুন ভাষা।

কৃতজ্ঞতা সন্দীপ রায় ও অরূপ দে
গবেষণায় সহায়তা অপরাজিত চক্রবর্তী
পাণ্ডুলিপি কপিরাইট সত্যজিৎ রায় সোসাইটি
কঠোপনিষদ্-এর শান্তিপাঠের অনুবাদ গৃহীত হয়েছে স্বামী ভূতেশানন্দ রচিত 'কঠোপনিষদ' গ্রন্থ থেকে।

ব্যাপার সহজপ্রাচ্য নয়

কেউ বলে, 'তাঁর ছবি বাংলা বটে কিন্তু প্রাচ্যের টিকিটিরও দেখা মেলে না।' কেউ জিজ্ঞেস করে, 'প্রাচ্যের বুঝি টিকি থাকে?' চন্দ্রিল ভট্টাচার্য

সত্যজিতের অবশ্য, বিপদ খুব। বিদেশিরা তাঁকে বলে, কে এক ভারতীয় ঋষি-টাইপ, তাঁর ছবিতে হুড়ুদ্দুম নেই, কেতা-কায়দা নেই, টেকনিকাল পালিশ কম, আঙ্গিক ব্যাপারস্যাপার স্তিমিত, যৌনতার ক্ষেত্রে শুচিবায়ুগ্রস্ত, গতি পেল্লায় ধীর, নায়কনায়িকা সব সাধারণ মানুষ, গড়, ঘটনাবলি নিতান্ত ম্যাড়ম্যাড়ে—এ স্লো দার্শনিক নির্ঘাত প্রাচ্যে ডক্টরেট। আর বাঙালিরা বলে, কী রে ভাই, কোথায় ন্যাদগ্যাদে আবেগ-টাবেগ দিয়ে হাঁউমাঁউ করে একেবারে ডাবাভর্তি কান্নার জোলাপ পরিবেশন করবে, যা বোঝাতে চায় তা দেগে দেগে আড়াইশোবার বলাবে, পেছনে প্রাণপণ মিউজিক দেবে, হৃৎপিণ্ড উথলে একুল ওকূল দু'কূল ভাসবে, তা না সব চরিত্র কেমন চাপা-চাপা, বাড়াবাড়ি ডিগনিফায়েড আচরণ করে চলেছে, অপূর্ব দেখতে সব শট, সটাসট কাট হচ্ছে, একটা মুহূর্ত বাড়তি দাঁড়ানো নেই, ভীষণ স্মার্ট চালচলন, মুচকি কৌতুক সারাক্ষণ তলে তলে বয়ে যাচ্ছে, দশটা কথার জায়গায় একটা কথা বলছে! এ প্রাণী সাহেব না হয়ে যায় না। ফলে সত্যজিতের ছবিতে আলাদা করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য খোঁজার চল খুব বেশি। বিদেশে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ছব্রি বড্ড ভারতীয়। আর বাঙালির অভিযোগ, বড্ড বিদেশি-টাইপ, ভদ্রলোক বাংলা ভাষায় ইংরিজি ছবি-করিয়ে।

বাঙালিদের ব্যাপারটা অবশ্য বোঝা সোজা। ব্যাকব্রাশ করে চুল আঁচড়াবে, অপূর্ব গমগমে গলায় চোস্ত ইংরিজিতে গড়গড়িয়ে কথা বলবে, বিদেশ থেকে সম্মান আসবে ফি বছর, সবসময় ফিটফাট ও সাংঘাতিক অভিজাত উপস্থিতি দেখে অন্য ক্যাবলাদের সমীহ চড়কগাছ হয়ে যাবে, আবার শোনা যায় বাড়ি ফিরে লুঙ্গি গুটিয়ে মুড়ি-লংকা খাওয়ার বদলে ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল শোনে! এ লোক আবার বাঙালি কীসের! আঁতেলদেরও গোঁসা হয়ে গেল। প্রথম ছবি থেকেই পাগলের মতো সাফল্য! এ আবার কী? গাদা গাদা আন্তর্জাতিক পুরস্কার, অবিশ্বাস্য খ্যাতি, সর্বস্তরে স্বীকৃতি! কোথায় না-খাওয়ার দীর্ঘ চিমড়ে ইতিহাস থাকবে, ক্যামেরার কাজ বা শব্দ জোড়ার কাজ হবে আলুথালু অন্যমনস্ক, প্রচুর ভুলত্রুটি করে তাকে আবছা থিওরি দিয়ে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা চলবে, নেশায়-বমিতে-নিয়মভাঙা আচরণে গজিয়ে উঠবে নিরন্তর চ্যালা ও পিলপিলে মিথ, সবসময় মজুত থাকবে অন্যরা কীভাবে চক্রান্ত করে উঁচুতে উঠতে দিল না এ নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ অভিযোগের বিষকাঁদুনি—তা না লোকটা কথাই বেশি বলে না, নিজের বিষয়েও বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস নেই, কোঁদলে উৎসাহ নেই, সর্বক্ষণ কাজ করে, পরিপাটি ও নিখুঁত, ধৈর্যশীল ও অসম্ভব মনোযোগী, ভীষণ মার্জিত ও রুচিমান, একটা প্রবল শৃঙ্খলা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ জীবন ও কাজ জুড়ে ব্যাপ্ত রয়েছে। তা হলে এ কে? নিশ্চয় একটা নাক-উঁচু লোক, একটা প্রাইজ-আকাঙ্ক্ষী। সিনেমায় ও ভাবনায় ধ্রুপদী, নিরীক্ষার সাহস নেই, রক্ত গরম নয়, হইহই করে পাঁচিল ভাঙতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না। প্রকৃত জোরালো সৃষ্টি মানেই যেখানে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, শৃঙ্খলাভঙ্গ, প্রচণ্ডতা, উগ্রতা, ঝোড়ো দাপট, সেখানে এ লোকটা পিতপিত করে হোমওয়ার্ক কষে দশটা শট এঁকে সেট-এ যায়, আর ছ্যা ছ্যা, কী পাতি, দশটা শটই নেয় ও তারপর প্যাক-আপ করে। এর মধ্যে লেলিহান সবতোড় আবেগ কই? স্রেফ ডিসিপ্লিনের দাস। সাহেব কোথাকার!

এ জন্য সত্যজিৎ নিজেও কিছু কম দায়ী নন। আইজেনস্টাইনের সিনেমা দেখে তিনি বলবেন বাখ-এর মিউজিকের মতো, পুদোভকিনের ছবিকে তুলনা করবেন বেঠোফেন-এর সঙ্গীতের সঙ্গে, 'চারুলতা'র একটা দৃশ্যকে বলবেন 'মোৎজার্টীয়', কারণ এখানে চারটি স্বর মিলে গড়ে তোলে এক বহুস্তরী টানাপোড়েন, চ্যাপলিনের ছবির রিভিউ করতে গিয়ে আনবেন 'ম্যাজিক ফ্লুট'-এর প্রসঙ্গ—আর লোকে 'সাহেবী' বলে গাল পাড়বে না? সত্যজিৎ নিজে বারবার বলেছেন যে তিনি হলিউড থেকে অনেক শিখেছেন, এবং জন্মে কেউ শুনেছে একটা লোক সিনেমা হলের অন্ধকারে বসে আমেরিকান পরিচালকদের 'কাট করার প্রক্রিয়া' বিষয়ে নোট নেয়? সে লোকটা অবশ্য উদয়শংকরের 'কল্পনা'ও বারবার দেখত এবং এমনকী নিজের পছন্দের শটগুলোর ছবি তুলতে ক্যামেরা নিয়ে যেত হল-এ, কিন্তু তা আমাদের ভুলে যেতে কতক্ষণ?

আমবাঙালি সত্যজিৎকে শ্রদ্ধা করে অসম্ভব, কারণ তিনি সাহেবদের কাছে সম্মান পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কয়েকটা সিনেমা বাদে বাকিগুলোকে আদপে ভালবাসে না। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' সকলেই দু'শোবার আহ্লাদে অষ্টাশি হয়ে দেখেছে, 'সোনার কেল্লা'য় জটায়ু ঢোকামাত্র সবাই এখনও উচ্ছ্বসিত চিৎকার করে ওঠে, যেন চ্যাপলিন পর্দায় আবির্ভূত হলেন, 'পথের পাঁচালী' দেখে সব্বার গলার কাছটা ব্যথা করে, 'অপুর সংসার' দেখে ভীষণ বিয়ে করাতে ইচ্ছে হয়, 'নায়ক'-এ উত্তমকুমারকে হেব্বি লাগে। ব্যস। এ ছাড়া মজামণ্ডিত 'মহাপুরুষ' ও 'সমাপ্তি'র নাম করতেই হবে। ক'টা হল? শেষ দু'টো ছোট ছবিকে যদি আধ-আধ ধরি, ছ'টা। লম্বা লোক পূর্ণদৈর্ঘ্যের কাহিনিছবি করেছেন ২৮টা। গবা গৃহপালিত ভিড় পেরিয়ে সত্যজিতের মাইল-মাইল দূরত্ব অবশ্য প্রথম ছবি থেকেই জ্বলজ্বল করছে। ওই ফিল্মেই ভারতীয় সিনেমা-শিল্পের তাবৎ নড়া ধরে নেড়ে বেড়া-কাঁটাতার-ব্যারিকেড তছনছিয়ে দিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু সে বড় স্নিগ্ধ তছনছ। লোকে কেঁদে আকুল হয়েছিল। এবং ওই জন্যই, অত সাংঘাতিক স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও, ছবিটাকে গ্রহণ করেছিল। তার পরের ছবিতেই স্টাইল একেবারে বদলে, একটি নিষ্ঠুর ও ভীষণ সত্যি আখ্যান বললেন, অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে। মা কষ্ট পায়, ছেলে তত কেয়ার করে না। মা ছুটিতে যেতে লিখলে দু'টো টাকা পাঠিয়ে ম্যানেজ করে দেয়। আর পরিচালক কোনও দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারা ছাড়াই ছবিটা দেখান। এতটুকু ভ্যালু জাজমেন্ট দেন না। দু'জনের প্রতি সমান দরদ রাখেন, কিন্তু 'ও যে তোর মা রে পাগলা' মর্মে কোনও যাত্রাপালাই রচেন না। তারসানাইও বেজে ওঠে না, অনুতাপদগ্ধ ছেলের কোলে টেনে টেনে ডায়লগ বলতে বলতে মা মারাও যান না। ছেলে মা'র অসুখের খবর পেয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে আসে, মা নেই বুঝে একটু কাঁদে, কিন্তু তারপর বেশ শক্ত পায়েই পোঁটলা গুছিয়ে বেরিয়ে যায়, শেষ দৃশ্যে গুমগুমে বজ্রগর্ভ মেঘের ডাক শোনা যায়, ব্যস। এ একটা মা-ছেলের গল্প হল?

বাঙালি জোরসে বিশ্বাস করে, শিল্প দু'রকম। এক, হৃদয় দিয়ে তৈরি। দুই, মস্তিষ্ক দিয়ে তৈরি। সে মনে করে, প্রথমটাই শিল্প, দ্বিতীয়টা ভান। প্রথমটায় বাঁধভাঙা আবেগের ভাগ বেশি, দ্বিতীয়টায় যুক্তির, বিশ্লেষণের। প্রথমটা বুক দিয়ে পড়বে, তোড়ে ভেসে যাবে, 'আমি অতশত জানি না ব্যস, ভালবাসি' বলে আষ্টেপৃষ্ঠে চরিত্রের

পক্ষ অবলম্বন করবে, দর্শকের-পাঠকের-শ্রোতার কলজে উল্লাসে/বিষাদে ফুঁড়ে দেবে। দ্বিতীয় রকমটা কিন্তু হাত দু'টো বুকের কাছে ভাঁজ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমস্তটা জরিপ করে নেবে, তার কাছে বাদ যাবে না তোমার লাবণ্য বা তোমার পায়ের কড়া, পাতার সজল সবুজ এবং অন্ধকার দগদগে শিরা-বের-করা পিঠ, এমনকী অসহায় ফ্যাঁসা আর্তনাদের হাস্যকরতাও নজর এড়াবে না, ইতিহাসের ছাত্র দালাল হয়ে গেলে বউদি বলবে দাদাকে জিগ্যেস করলেই জানা যাবে দালালের সুন্দর সংস্কৃত প্রতিশব্দ, আর মধ্যবিত্ত পুরুষ সারাক্ষণ একটি মহিলার সান্নিধ্য কামনার পর নারী নিজে যখন বুকে টেনে নেবে তার হাত, পুরুষ ভিতু ঠোঁট চাটা ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না এবং ঘড়ির কাঁটা টিকটিক করে টিটকিরি দিয়ে যাবে তার মুরোদহীন দুরুদুরু-কে। এই প্রথম শিল্প-ধরনটা, যে 'ডুবতে রাজি আছি' ঘোষণা করে ঝাঁপ খায়, হচ্ছে 'বাংলা', বা টানাটুনি করলে, 'ভারতীয়'। আর দ্বিতীয়টা, যে সব একঝোঁকামি বর্জন করে খতিয়ে ও তীব্র নেড়েচেড়ে কানকো তুলে দেখে নেয় জীবন, হল 'পাশ্চাত্য'। দু'রকম ধাঁচেই মহৎ শিল্প রচিত হতে পারে—বাঙালি এ কথা মানে না। সে সার্টিফিকেট দেয় শুধু প্রথমটাকে। আর অন্য সব কিছুকে সে বলে, ধুস! ও তো এইখেনটায় এসে লাগছে না। নিজের বুকের মধ্যিখানটায় তর্জনী দিয়ে দেখায়।

সত্যজিৎ যে বংশের ছেলে, আর যে পরিবেশে মানুষ, তাতে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য—দুয়ের সম্ভারকেই নিজের স্বাভাবিক উত্তরাধিকার মনে করা, আর দুই থেকেই ইচ্ছেমতো অনাড়ষ্ট ও সাবলীল ভাবে আহরণ তাঁর চরিত্রে আশ্চর্য কিছু নয়। তিনি প্রবল মনোযোগ নিয়ে বাখ-ও শুনেছেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত-ও। পি জি উডহাউস-ও পড়েছেন, কালীপ্রসন্ন-ও। সত্যজিতের ঠাকুর্দা টেলিস্কোপে রাতের আকাশ দেখতেন, এবং টুনটুনির বই লিখতেন। সত্যজিতের বাবা বিলেত গিয়ে ইংরিজিতে হাফটোন প্রিন্টিং নিয়েও প্রবন্ধ লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ নিয়েও। ননসেন্স ক্লাবে বিবেকানন্দ নিয়েও আলোচনা করেছেন, তুর্গেনেভ বা প্লেটো নিয়েও। সত্যজিতের ছবিতে যেমন মেমোরি গেম-এ অসীম (কিছুটা ইমপ্রেস করার তাগিদেই) শেক্সপিয়র ও টেকচাঁদ ঠাকুর, দু'টো নামই বলে। তাঁর ফিল্ম দেখার ক্ষেত্রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য অসুবিধেরও ডিস্ট্রিবিউশন দিব্যি। চারুলতা-য় অমল যখন 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' বলে উল্লসিত চিৎকার করে ওঠে বা গুনগুনিয়ে গায় 'যব ছোড় চলে লখনৌ নগরী', তখন পাশ্চাত্য দর্শকরা তার কোনও রসই নিতে পারেন না। আবার অমল যখন দাদাকে খ্যাপানোর জন্য পিয়ানোয় 'গড সেভ দ্য কুইন' বাজায়, কিংবা ভূপতি কথায় কথায় মুড়িমুড়কির মতো গ্ল্যাডস্টোন, লিবারাল, টোরি বলতে থাকে, বা ডিজরায়েলি-র নিকনেম 'ডিজি' আউড়ে অমলের ব্রেন ঘুলিয়ে দিয়ে মহা মজা পায়, আমরা অমলের মতোই হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। এই দুই হাঁ-রই কারণ, সত্যজিতের মেধা ও উৎসাহের রাজ্যে কোনও গোলার্ধবাচক 'না' নেই। সত্যজিৎ পাশ্চাত্য থেকে নিয়েছেন তাঁর ছবির কারুকাজের ধাঁচ, গল্প বলার স্ট্রাকচার, সপ্রতিভ কাট করার শিক্ষা, অ্যামেচার আনকোরা অভিনেতাদের দিয়ে কাজ করার সাহস, মেক-আপ না-ব্যবহার করার স্পর্ধা, একদম স্বাভাবিক সংলাপ ও বাস্তবানুগ অভিনয় দিয়ে সিনেমা সাজানোর দীক্ষা। আর প্রাচ্য থেকে নিয়েছেন, তার আত্মা।

তবে, এ জিনিস পৃথিবীর সব বড় পরিচালকের ক্ষেত্রেই সত্যি। যে কোনও বিরাট শিল্পীই মহা উল্লাস আর প্যাশনেট উৎসাহ নিয়ে উত্তর দক্ষিণ নৈর্ঋত ঈশান—যে কোণ থেকে পারেন বহুরকম পড়েন দেখেন শোনেন, এবং সব কিছু থেকেই ক লিটার খ আউন্স গ মণ ঘ সের বেধড়ক আহরণ করতে থাকেন। তারপর, এই নানা প্রচুর বিবিধ অসংখ্য উৎস থেকে ক্লোরোফিল আত্মস্থ করে নিয়ে, কোন প্রক্রিয়ায় কোন সিজনে কোন আশ্চর্য ফল যে ফলবে, তা হবে পুরোপুরি মিষ্টি না কিঞ্চিৎ কষায়, সেখানে থাকবে শক্ত খোসা না কোমল আবরণ, সে কথা কেউ জানে না। ফলের স্বাদ নিতে নিতে কেউ যদি ঠোঁট কুঁচকে ভাবার চেষ্টা করে এর মধ্যে ঠিক কতটা সূর্যালোক পুব দিক থেকে পড়েছে আর কতটা পশ্চিম থেকে ফোকাস মেরেছে, খামোকা ব্যায়াম!

আর নিজ দেশ ও নিজ কাল তো সৎ শিল্পে বিনা নেমন্তন্নেই

পাত পেড়ে বসে যাবে! বাংলা নিয়ে ছবি, বাঙালি মানুষ নিয়ে ছবি, শিল্পগত যুক্তিতেই তা বাংলার শেকড়বাকড় অনবরত জাপটে নিতে দায়বদ্ধ। আর সত্যজিৎ এত বড় চলচ্চিত্রকার, তাঁর রচিত যে কোনও দৃশ্যই একাধিক স্তরে খেলা করে। প্রত্যক্ষভাবে পর্দায় যেটুকু দেখছি, তার তলায় তলায়, পাশে পাশে আরও অনেক কিছু চলে, চলতে থাকে। ছবি সবসময়ই ফ্রেমের অনেক বাইরেও বিস্তৃত হয়ে যায়। তা আমাদের কিছুই না-বলে অনেক কিছু বলে, চরিত্র সম্পর্কে, তাদের চুপ করে থাকা মুখের ভাবনাস্রোত সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব আন্দাজ তৈরি করতে প্রণোদিত করে, মানে-তৈরির মেশিন উসকে দেয়। এবং তা করতে গিয়ে তাঁকে ব্যবহার করতে হয় অসংখ্য ডিটেল, নিজ দেশ ও কাল থেকে লাগাতার সংগ্রহ করতে হয় অজস্র উপাদান। আর তার অমোঘ প্রয়োগে, অধিকাংশ সময় 'প্রাচ্য' প্রেজেন্ট প্লিজ দিয়ে যায়ই। ইন্দির ঠাকরুণ আঙুলের মাথা থেকে চেটে চেটে খান, পালকি-বেয়ারার হুমহাম আর ফেরিওলার ডাকে গড়ে ওঠে ১৮৭৯-এর ঠা-ঠা দুপুর, অপু ছাদে দাঁড়িয়ে বাঁশিতে এক অপূর্ব সুর বাজায় যা বিদেশির কাছে সুন্দর মেলোডি মাত্র আর বাঙালির কাছে স্পষ্ট আনন্দ-আকুতি যদি তারে নাই চিনি গো সে কি আমায় নেবে চিনে। মানে, মোদ্দা ভাষায় ওঁর অপূর্ব চিত্রনাট্য আর তা ধারণ করার কুশলী ভিসুয়াল, প্রতিটি মুহূর্তকে এতগুলো অসামান্য অনুপুঙ্খ দিয়ে সমৃদ্ধ করার স্টাইল—তার পূর্ণ রস নিতে গেলে বাংলা সংস্কৃতি সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে, ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবেই। সত্যজিতের অতুলনীয় বাংলা সংলাপও সাবটাইটেলে সম্পূর্ণ অনুবাদযোগ্য নয়।

এ জিনিসও, আবার, পৃথিবীর সব বড় পরিচালকের বেলাতেই খাটে। বার্গম্যানের একটা চরিত্র যখন স্ট্রিন্ডবার্গের নাটক পড়তে শুরু করে, এবং তার আগে তাঁকে নারীবিদ্বেষী বলে, আমরা কি তার পুরো ব্যাঞ্জনাটা ধরতে পারি? তারকভস্কির একটি চরিত্র, যে ছাপাখানায় কাজ করে, একটা মুদ্রণপ্রমাদ তার চোখ এড়িয়ে গিয়েছে বলে এমন ভয়ানক উদ্বিগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে, আমরা অবাক হয়ে যাই, যদি না পরে পড়েশুনে জানি যে ওখানে স্তালিনের জমানা দেখানো হচ্ছে, এবং এটা আসলে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের প্রতীক। গোদারের একটা চরিত্র প্যারিসের পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর সময় আমরা ভয়েস-ওভারে যে অসামান্য বাক্য শুনে চমকে উঠি, তা যে আসলে মঁতেন-এর ম্যাক্সিম থেকে কোটেশন, তা জানতে পারলে আমাদের প্রাণে বাক্যটির পুরো তাৎপর্য এসে বাজত। প্রতিটি জিনিয়াস তাঁর সন্নিহিত ভূগোলকে, তাঁর দেশের অতীতকে ও সমকালকে, তাঁর উত্তরাধিকারকে ও চালচিত্রকে, বাই ডিফল্ট, শুষে নেবেনই। না নিয়ে তিনি যাবেনই বা কোথায়? চারপাশে যে বায়ুমণ্ডল ঘিরে রেখেছে প্রাথমিক অক্সিজেন তো তা থেকেই নিতে হবে। এরপর তিনি অবশ্যই ইচ্ছে করলে আরও আরও আকাশকে আঁকশি দিয়ে টেনে আনবেন তাঁর নিজস্ব ছাদের ওপর, অচেনা উপত্যকার নদীকে বইয়ে দেবেন বৈঠকখানার পাশে, এবং তা থেকে সংগ্রহ করবেন নিজস্ব জ্যোৎস্না বা তৃষ্ণা, এবং এই অনবরত মিলমিশ থেকেই তৈরি হবে তাঁর নিজস্বতা, যে স্টাইল দেখে আমরা তক্ষুনি চিনতে পারব তাঁর সই, সে নাম-দেখানো হয়ে যাওয়ার পরে হল-এ ঢুকলেই বা কী?

আসলে, বাঙালি জাতের হাটে সত্যজিতের সবচেয়ে বড় ঝঞ্ঝাট হল, তিনি যা-ই করেন, যা-ই, সে 'জন অরণ্য' ছবিই হোক আর 'কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘ'-এর প্রচ্ছদ, তাতে একটা প্রখর, ক্ষুরধার বুদ্ধির ছাপ থাকে। একটা শাণিত তরবারির মতো ওঁর পর্যবেক্ষণ, ওঁর বিশ্লেষণ ও বিন্যাস। এটাকে বাঙালি অন্তর থেকে ঘেন্না করে। বুদ্ধিকে সে ভাবে, চালাকি। নির্বুদ্ধিতাকে, আন্তরিকতা, সততা। তার প্রাণের শিল্পকে হতে হবে গম্ভীর, গ্যাদগ্যাদে এবং শিশুপাচ্য। দৃশ্যের পরতে পরতে দুরন্ত স্মার্টনেস থাকলে, যে কোনও পরিস্থিতিকে—এমনকী অন্ধকার ট্র্যাজেডিকে—অসামান্য কৌতুকের আলপনায় বর্ডার দিয়ে দিলে, বাঙালির ল্যাদাড়ুস মনোপিণ্ড ঘাবড়ে চরকি খায়। এর প্রকৃত গ্যাঁড়াকলটা অন্য। দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত কোনও কিছুকে উপভোগ করতে গেলে, আত্মস্থ করতে গেলে, উপভোক্তাকেও বুদ্ধি খাটাতে হয়। ঝুঁকে, মন দিয়ে ছবিটা দেখতে হয়। সারাক্ষণ উন্মুখ, সতর্ক, টানটান থাকতে হয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ঢং ঢং করে ঘড়ি বাজে আর মাঠে বসা অপুর মুখ আমরা দেখি, এবং তক্ষুনি ক্যামেরা চলে যায় আড়বোয়ালের বাড়ির উঠোনে অপুর তৈরি করা সূর্যঘড়ি-তে, যেখানে সর্বজয়া একলা বসে কাটাচ্ছে অপুর জন্য ছটফটিয়ে দিনের পর দিন মাসের পর মাস—এ তো শুধু সর্বজয়ার সিন শুরু করার তরিকা নয়। এর মধ্যে অপুর অপরাধবোধ লাইনের পর লাইন লিখিত আছে। অপুর যৌবনের হইহই দ্রুত সময় আর প্রৌঢ়া সর্বজয়ার না-কাটতে চাওয়া সময়ের আখ্যানও। কিন্তু, দর্শককে সে লেখা আবিষ্কার করতে হবে। পরিচালক কিচ্ছুটি বাতলে দেবেন না। এটা ভারী অস্বস্তির ব্যাপার। সেই আমাকেই যদি খেটেখুটে জিনিসটা বুঝতে হল, ব্রেনে চনচন করে এনার্জি চালাতে হল, তুমি আছ কী করতে? তুমি পর্দায় সিনেমা দেখাবে, আর আমি অঙ্কের ছাত্রের মতো শিরদাঁড়া সোজা করে 'এই এই ফস্কে গেল' ভয় বগলে করে নোট নেব? তুমি আমায় নিজ গরজে গিলিয়ে দেবে না গোল্লা পাকিয়ে নাড়ু সাজিয়ে থালায় থরে থরে রেখে? শহর থেকে অজ গাঁয়ে আসা পোস্টমাস্টার প্রথম কাজ বুঝে নিয়ে আস্তে আস্তে সন্তর্পণে খামগুলোয় ছাপ মারছে, চমৎকার। তারপর যেই না সে অসম্ভব দ্রুত দড় দক্ষতায় ফটাফট ছাপ মারছে—যা ছিল আনকোরা কাজ তা আজ তার অনায়াস সহজ অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে—এই সূত্র ধরে আমি বুঝে নেব সময় কেটে গিয়েছে বেশ কিছু দিন? কেন? ক্যালেন্ডারের পাতা উড়ে উড়ে যাচ্ছে দেখাতে পারলে না? সর্বজয়াকে মনিবানী বললেন, তুমি আমাদের সঙ্গে দেওয়ানপুর যাবে তো? সর্বজয়া মাথা নেড়ে বলল 'আচ্ছা'। ভাল কথা। হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সর্বজয়া দেখল অপু হুঁকোর ডাবায় ফুঁ দিতে দিতে যাচ্ছে, আর তার ধাপে ধাপে নামার গতি ধীর হয়ে এল, অমনি কোত্থেকে ট্রেনের হুইস্‌ল, ওমা, চট করে দৃশ্য বদলে এরা ট্রেনে চড়ে ফিরে যাচ্ছে গ্রামে! আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, ভাল করে বলবে তো ভাই, কী হল, মত কী করে উল্টে গেল, কখন মা বুঝতে পারল এরা নিরাপত্তা দেবে, কিন্তু ছেলেকে চাকর বানিয়ে দেবে, তারপর বেশ কাঁটা দেওয়া সব ডায়লগ হবে, আমি না খেয়ে মরব তবু তোকে গোলাম হতে দেব না, তা না অমন হুড়হুড় করে সব সরিয়ে নিলে তাল রাখতে পারি? ছবি দেখতে এসেছি রে বাপ, এগজামিন দিতে আসিনি।

আর এর সঙ্গে জুড়ে আছে সত্যজিতের বিখ্যাত, বহুবিশ্রুত পাশুপত আন্ডারস্টেটমেন্ট সংযম তাঁর ক্যামেরা আদ্ধেক সময়েই গরজ দেখায় না দেগে দিতে, গেদে দিতে, একদম কাছে গিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে সম্পাদনার ধাঁচেও কোথাও এক কণাও বেশিক্ষণ শট ধরে রাখার তাগিদ লক্ষ করা যায় না। কম বলে, ইঙ্গিত দিয়ে পরিচালক স্রেফ সরে বলেন, 'যথেষ্ট'। ইলাস্টিকের মতো বাড়িয়েচাড়িয়ে ভাবসম্প্রসারণে উৎসাহই নেই। উনি যেন চরিত্রগুলোকে আঁকড়ে ধরছেন না, তাদের বেদনায় কোনও হুলস্থূল পাকিয়ে তোলার দায়ই তাঁর নেই, তিনি কিছুটা নির্বিকার, নিরাসক্ত দৃষ্টিতে শুধু ঘটনাগুলো ও তার আত্মা উন্মোচন করছেন। মেয়ে-মরা-মা গালে হাত রেখে চুপ করে বসে আছেন, প্রতিবেশী বালিকার ডাকেও তাঁর সম্বিৎ ফেরে না, হঠাৎ হরিহরের 'অপু-উ' ডাক শুনে তিনি নড়ে ওঠেন, হাতের শাঁখা স্লিপ করে নেমে আসে। 'এই শাঁখার দোলাই যেন তার বুকের দোলা।' মহা দুরন্ত ডানপিটে টমবয়-গোছের মেয়ে অ্যাদ্দিন গাছে চড়ে বুনো কাঠবেড়ালি নিয়ে খেলে দিন কাটাত, বহু কাণ্ডাকাণ্ডের পর তার হৃদয়ে প্রেমের উন্মেষ ঘটে। সে যখন সলজ্জ মুখে স্বামীকে চিঠি

লিখতে বসেছে, তার সামনে বর্ণপরিচয়ের পাতা খোলা (কারণ, সে তো বানান ভাল করে জানে না), এবং সেখানে অনেক শব্দের সঙ্গে ছাপা আছে 'রমণী' ও 'জননী'। ফট করে চোখে না পড়ে গেলে শব্দ দু'টো নজরেই আসবে না। ফ্রেমের একেবারে কোণায় তারা বসে আছে, অনেকটা দ্যোতনা মুখে নিয়ে। আর 'গুপী গাইন'-এ গুপীকে গাধার পিঠে চাপিয়ে সব্বাই সোল্লাসে রওনা করে দেওয়ার পর সেই ভীষণ ছোট্ট মুহূর্তের শটে চাদরের খুঁটে গুপীর বাবার চোখ মুছে নেওয়া কোন পাষণ্ড ভুলতে পারে? আমরা গুপীর বাবার চরিত্রকে এতক্ষণ দেদার মজার চোটে পাত্তাই দিইনি। আর ওইটুকুতেই কত না-বলা দিনরাত্রি ও মোচড়ানো বেদনা ধাঁ করে উন্মোচিত হয়ে যায়। কিন্তু ততক্ষণে ওয়াইপ শুরু হয়ে গিয়েছে। পর্দায় জায়গা নিয়ে নিচ্ছে পরের শট। কারণ এটা রচছেন সত্যজিৎ রায়, যাঁর সিনেমা দেখতে হতে হয় সত্যজিৎ রায়ের দর্শক।

আরও সাংঘাতিক, লম্বা ভদ্রলোক ইন্টারভিউতে বলেন, অতিনাটকীয়তার শেষ চিহ্নটুকুকেও তিনি তাঁর ছবি থেকে বহিষ্কার করতে চান। তাঁর প্রথম ছবিতেই গাঁয়ের মেয়ে আঁতুড়ে প্রসবযন্ত্রণায় ছটফট করে তবু ঠোঁট টিপে থাকে, চেঁচায় না। প্রেম ভেঙে যাওয়াকেও উনি মুড়ে রাখেন কৌতুকে। এক ছবিতে হিংস্র গামবাট প্রেমিক মেয়েটির চুল ধরে টানতেই পরচুলা হাতে উঠে আসে, অন্য ছবিতে নিরীহ দুর্বল প্রেমিক ক্রন্দনরতা প্রেমিকাকে হুল ফুটিয়ে বলে রুমালটা রেখে দিতে, ফেরার পথে বাসে কান্নাটান্না পেলে কাজে লাগতে পারে। এমনকী মৃত্যুকেও উনি যে খুব রেয়াত করেন, তা না। হরিহরের শ্বাস ওঠার পর সর্বজয়ার শোক-আর্তনাদ এসে পড়ে কাশীর ঘাটের পায়রাদের ওপর, তারা উড়ে যায়, এরপর দু'টো মাত্তর শট, অপুকে কাছা পরানো ও নদীতে নিয়ে যাওয়া, ব্যস। গল্প বয়ে চলে। আবেগকে খাজনা সত্যজিৎ কি দেন না? কেউ কি তাঁর সিনেমায় ফুলে ফুলে কাঁদে না, কেউ ভেঙে পড়ে কপালে হাত রেখে বলে না 'কী ভেবেছিলাম আর কী হয়ে গেল', কেউ বউয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে বার্তাবাহক শালাকে ঠাস করে চড় মারে না, কেউ রেগে ইন্টারভিউয়ারদের টেবিল উল্টে দেয় না? নিশ্চয়ই এসব হয়, গল্প দিয়ে শিল্প সাজাচ্ছেন তিনি, আবেগকে খামোকা অস্পৃশ্য ধরতে যাবেন কেন? কয়েক পাক তাকে ট্রট করতে দেন, কিন্তু একেবারে কৃপণের শক্ত মুঠিতে বল্গা ধরে থাকেন। অথবা, বাকি পুরো ছবিটাকে এমনই আলট্রা-সংযত মেজাজে বাঁধেন যে, একটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বাঁধ ভেঙে দেওয়াটা একেবারে সাংঘাতিক অভিঘাত সৃষ্টি করে। সেও, একটু উল্টো দিক থেকে, নাটকীয়তা-বর্জনেরই অর্জন।

এমনকী 'মেসেজ', বাঙালির এত প্রিয় শব্দ ও শিল্পরচনার প্রায় একমাত্র উদ্দেশ্য বলে গণ্য, তা বিতরণ করারও ন্যূনতম তাড়া সত্যজিতের মধ্যে দেখা যায় না। (অবশ্য শেষ তিনটি চলচ্চিত্রের ব্যাপারে আলাদা, তা ওগুলোকে ঠিক সত্যজিতের সিনেমা বলে গণ্য করাও শক্ত।) সত্যজিৎ নিজেকে ভাষ্যকারের দায়িত্ব দেন, মসিহা-র নয়। ওঁর সিদ্ধার্থ অথরিটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শহর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়, তার নতুন কুঠুরির ছাদে এসে দাঁড়িয়ে অনেকদিন বাদে ছোটবেলার পাখির ডাক শোনে, এবং একইসঙ্গে শোনে শব-মিছিলের ধ্বনি 'রাম নাম সৎ হ্যায়', পাখা-কোম্পানির কাঙ্ক্ষিত পদে সাংঘাতিক প্রোমোশন সত্ত্বেও শ্যামলেন্দু মাথা নিচু করে বসে থাকে আর উঁচুতে ক্যামেরার সামনে পাখা ঘুরে চলে, টুটুল শ্যামলেন্দুর দেওয়া ঘড়ি ফিরিয়ে দিয়ে অতর্কিত ডিজলভে অন্তর্হিত হয় দৃশ্য থেকে, সোমনাথ বন্ধুর বোনকে বেশ্যা হিসেবে ভেট দিয়ে অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজটা পেয়ে যায় ও নিজের ছায়ার সঙ্গে নতমাথায় পা টানতে টানতে বাড়ি ফিরে বলে 'ইয়েটা হয়ে গেল বাবা', আর বৃদ্ধ বাবা, যিনি বারবার এই সময়ের উদ্ভট নীতিহীনতাকে বিকৃত প্রবণতাকে প্রশ্ন করে চলেন সারা ছবি জুড়ে, এবার নিশ্চিন্ত হেসে বলেন, 'যাক, এতদিনে তা হলে...'। সত্যজিৎ জাফরিকাটা গরাদ-গরাদ আলোছায়ার বারান্দায় তাঁকে ফ্রিজ করে দেন। মন্তব্য কি আর সত্যজিৎ করেন না? চাবুক কি আর মারেন না? আলবাত। নইলে আর্টিস্ট কীসের? প্রতীক ব্যবহার করেন না? গাদা গাদা। বরং একটু বেশিই। ভাল-মন্দ বিভাজন করেন না? নির্ঘাত। কিন্তু তার ভঙ্গি অনেক শমিত, অনেক সংহত। বুদ্ধি দিয়ে জারিয়ে নেওয়া, পরিশীলন দিয়ে সাঁতলানো। যে চ্যুত হয়েছে, তার প্রতিও সত্যজিৎ নির্মম হন না, কারণ এই পরিস্থিতিতে তার আর কী করার ছিল, অসহায় ভাবে চলতি স্রোতে ভেসে যাওয়া ছাড়া, তা বাতলে দেওয়ার ক্ষমতা ওঁর নেই। সেই বেদিতে চড়ার লোভ সত্যজিৎ খুব সচেতন ভাবেই পরিহার করেন। সবজান্তা হামবড়ার মতো হাঁউহাঁউ করেন না, উপদেশের গ্যাঁজলা তুলে ছবি শেষ করেন না, আরোপিত ইতিবাচকতা দিয়ে নিজেকে লঘু করেন না, 'এই দ্যাখো না আমি কেমন প্রফেট হয়েছি' খ্যালেন না। বুদ্ধি আর সংযম—ওঁর প্রতিভা এই দুই হাতে শর-যোজনা করে। আর বাঙালি শিল্পে চায়: ন্যাকামি ও আতিশয্য। ফলে, সত্যজিৎ বাঙালির কাছে, পাক্কা সায়েব হয়েই থেকে যান। 'পাশ্চাত্যের প্রভাবে ছবি করে।' 'হ্যাঁ হ্যাঁ, স্টাইলটা তো পুরো হলিউড থেকে তোলা, আর বাকিটা দারিদ্র্য-দুর্দশা বিক্কিরি', 'সাহেবদের জন্যে ছবি করে, সাহেবরাই প্রাইজ দেয়। তোমার-আমার কী লেনাদেনা বলো ভায়া?'

এবং আশ্চর্য, তাঁর এই আত্যন্তিক সংযমকে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকাকে, চরিত্রদের কোলপাঁজা করে না-থাকাকে বিদেশিরা বলেন 'ব্রাহ্মণ্য' বৈশিষ্ট্য, প্রাচ্যের ট্রেডমার্ক। একই কারণে একটা লোককে দু'টো বিপরীত বিশেষণ শুনতে হচ্ছে, প্রবল বিস্ময়-কাণ্ড বই কী। বিদেশিরা সত্যজিৎকে দেখছেন এক ধ্যানস্থ মুনির মূর্তিতে, যে সুখে বিগতস্পৃহ, দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা, মেলোড্রামার সিদ্ধাইয়ের লোভ যে অনায়াসে পরিত্যাগ করেছে। যে 'পথের পাঁচালী'-র মতো একটা আবেগ-সম্ভাবনাময় ছবিকে শেষ করে স্রেফ গরুর গাড়িতে ওদের বিষণ্ণ, উদাসীন চলে যাওয়া দিয়ে। একটা দুর্গার ভয়েস-ওভার অবধি ব্যবহার করে না, 'অপু, আমাকে একদিন রেলগাড়ি দেখাবি?' অমন একটা ছবির একদম শেষ প্রান্তে এসে ডুকরে-ওঠা কান্না-ক্লাইম্যাক্সের সুযোগই নেয় না। শুধু সর্বজয়া আঁচলে মুখ চেপে কাঁদে, হরিহর একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়, অপু সামনে তাকিয়ে থাকে। 'চারুলতা'য় শেষ দৃশ্যে ভূপতি যখন ফিরে আসছে আমরা একটা ঝড়ের জন্য তৈরি থাকি। একটা ঝড় আগে উঠেছে, কাচও ভেঙেছে (ঠিক যেমন ভেঙেছিল অমল ছবিতে প্রথম আবির্ভূত হওয়ার সময়), চারু ঠাকুরপোর নাম করে ফুলে ফুলে কেঁদেছে, ভূপতি তা দেখে যা বোঝার, বুঝেছে। চারুর কাছেও স্পষ্ট হয়েছে, ভূপতির এই জেনে যাওয়া। তারপর ভূপতি কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছে তার ঘোড়ার গাড়িতে, আর চারু স্নান সেরে, আয়নায় সিঁদুর পরেছে। (এই সান্ধ্য রিচুয়ালের তাৎপর্য এখানে কী, পাশ্চাত্য তার কী বুঝবে?) এমনকী যে নকশা-তোলা চটি চারু প্রথমে ভূপতির জন্য তৈরি করেছিল, পরে অমলকে দিয়ে দেয় (যা প্রথম সূচিত করে ভূপতির প্রতি অবহেলা ও অমলের প্রতি নিবেদন), সে-চটি ভূপতির জন্য ফেরতও এনেছে। এইবার তারা এই ভয়ানক জানাজানির পর প্রথম মুখোমুখি হবে। স্তব্ধ সন্ধেবেলা জুড়ে দর্শকের ধুকধুকে অপেক্ষার পর কী হয়? চারু বলে, 'এসো', 'এসো', হাত বাড়িয়ে দেয়। ভূপতি হাত বাড়ায়, কিন্তু পরিচালক বজ্রাঘাতের মতো দু'টি বাড়ানো হাত মেলার আগে তাদের ফ্রিজ করে দেন। কী অকল্পনীয় সংযত অথচ জিনিয়াসোচিত শেষ! এই দৃশ্যে কী না হতে পারত? অন্য পরিচালকের হাতে পড়লে ঘড়া ঘড়া জল বয়ে যেত, লণ্ঠন ভেঙে আগুন ধরে যেত। সংসার দাউদাউ করে জ্বলত, দু'টি হৃদয়ও। পর্দাও। হয়তো শেষে ক্ষমাসুন্দর মিলনে আঁধার উজ্জ্বল হয়ে উঠত। হয়তো বিচ্ছেদের তোড়ে বৃন্তচ্যুত ফুলের মতো দু'জন দু'দিকে পড়ে থাকত। কিন্তু

এখানে স্রষ্টা পুরোটা দর্শকের কল্পনার ওপর ছেড়ে দেন। এই মৌলিকতা, এই ঠাট, এই স্ব-ধরন সত্যজিৎকে পাশ্চাত্যের কাছেও শ্রদ্ধেয় করেছে, এবং অনেকাংশে সুদূর।

তারা ভেবেছে, এই লোকটা কী করে অব্যর্থ শর সংবরণ করে, 'ফাটিয়ে দেব' মনোবৃত্তিকে লগা দিয়েও ছোঁয় না, আশ্চর্য কাণ্ড ঘটাবার সুযোগ পেয়েও ক্রমাগত বিশ্বাস্য ঘটনার দিকে ঝুঁকে পড়ে, সাধারণ মানুষের খুঁটিনাটিময় সত্যিগুলো এর কাছে বারেবারে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্লট মেনে চলে, গল্পও বলে নিপুণ, কিন্তু কিছুতেই নাটকীয় পরিণতি বা তুঙ্গস্পর্শী পরিস্থিতি পছন্দ করে না, দর্শককে একেবারে বিমুগ্ধ বা বিহ্বল করে দেওয়ার, তাদের বুকে ঝড়াস করে ভল্ল মারার সব তাস হেলায় হাটিয়ে দেয়। এ প্রবণতা কিন্তু হলিউডের একদম উল্টো। একদম। ওদের গোটা জাদুটাই হচ্ছে লার্জার দ্যান লাইফ চরিত্র নিয়ে, বা সাধারণ দুর্বল অসহায় লোকটি কীভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে লার্জার দ্যান লাইফ হয়ে উঠল, তা বর্ণনায়, একখানা সাক্ষাৎ নাগরদোলা বনবনানোয়। সত্যজিৎ সেসবের ধার দিয়ে তো যানই না, এমনকী, আশ্চর্য, তাঁর কারুকাজকেও করে নেন হলিউডের তুলনায় অনেক নিরেস। মূল ব্যাকরণটা হলিউড থেকে আহৃত, কিন্তু তারপর স্বকীয়তাটা দেখুন, তিনি সটান বর্জন করেন সকল অবান্তর ট্র্যাপিজ। তাঁর ক্যামেরা অত ছলবলে নয়, বরং বহু সময় চুপ বা অতি ধীর, সম্পাদনা অহেতুক দ্রুত হয়ে ঝকঝকানি দেখায় না, 'কাট' করার, ক্যামেরাকোণ বদলাবার সব সময় কাহিনিগত প্রয়োজন থাকে, একটা উদ্দেশ্য, শুধু স্মার্ট দেখাবে বলে উনি কিচ্ছুটি করেন না, নিজের টেকনিকের প্রতি দৃষ্টি টানার কোনও ইচ্ছেই তাঁর নেই। চরিত্র ওঁর কাছে আসল, বক্তব্যই মূল ও একমাত্র বিবেচ্য, তাকধাঁধানি কেরদানি নয়। এ-ও ট্র্যাজেডি সত্যজিতের টেকনিক ভারতীয় পরিচালকদের তুলনায় এত ঝকঝকে, যে তাঁকে চরম শত্রুও 'মিস্তিরিগিরিটা ভালই পারে, হলিউড থেকে শিখেছে' বলে দুয়ো দেয় (এবং নিজ গোষ্ঠীর/আইকনের অ-দক্ষতাকে 'হলিউডকে অস্বীকার' বলে উতরে দেওয়ার চেষ্টা করে), অথচ তা হলিউডের তুলনায় এতটাই স্বেচ্ছা-নিষ্প্রভ, যে ওরা এটাকেও অতিমানবিক সংযমের আরেকটা অঙ্গ বলে চিনে নিতে পারে।

কিন্তু হলিউড, এবং অ-হলিউড বিদেশও, তাঁর যা দেখে সবচেয়ে অবাক হয়ে যায়, তা হল 'টেম্পো'। গতি। তাদের মতে, এমন ধীর গতি যে কারও ছবির হতে পারে, কল্পনার বাইরে। ভয়ানক একঘেয়ে, অসহ্য আস্তে, কিছুতেই চলতে চায় না গোছের মনে হয় তাদের সত্যজিতের ছবিকে। সমালোচক লেখেন, 'চারুলতার চলন একটা অভিজাত শামুকের মতো, যা অবশ্য সত্যজিতের যে কোনও ছবিরই।' সোজা কথা, ওদের ঠেসে বোর লাগে এই মন্থরতা। আমাদের কাছে কিন্তু অত স্লো মনে হয় না। কেন? এইখানে একটা উত্তর লুকিয়ে রয়েছে চমৎকার। কারণ, আমরা অনেক কিছু পড়তে পারি ফিল্মগুলোয়, নিরন্তর, যা বিদেশিরা পারে না। সেইগুলোই হচ্ছে 'প্রাচ্য' উপাদান। মেমোরি গেম-এ রবীন্দ্রনাথ ও কার্ল মার্কস-এর পর রবি ঘোষ যখন বলে ওঠেন 'অতুল্য ঘোষ', তখন সেই মজাটা ওঁরা বুঝবেনই বা কী করে, আর এখানে রবি ঘোষ অভিনীত চরিত্রটা সম্পর্কে যা বলা হল (লোকটার লঘুগুরু জ্ঞান নেই, আপন খেয়ালে আছে), তা-ই বা তাঁদের মগজে ঢুকবে কী করে?

অবশ্য, এখানে একটু পণ্ডিতিও ফলানো যেতে পারে। 'প্রাচ্যতা' বলতে বিদেশি সিনে-বিশারদরা শুধু এই পাশ্চাত্যের অগম্য বিশেষ আঞ্চলিক ব্যাপারগুলোকে বলেন না কিন্তু। ওঁয়ারা নজর দেন যেগুলোর প্রতি, তার একটা হল প্রাচ্যের 'সময়'। বিদেশের সময় হল 'লিনিয়ার', আর আমাদের সময় হল 'সার্কুলার'। মানে কী? মানে নেই। এমনি গালভরা কথা। কিন্তু আমরা, প্রবল গাঁইয়া ও উদ্ধতভাবে, আসুন নিজেদের মতো একটা মানে আরোপ করার চেষ্টা করি। পাশ্চাত্যের সময় একরৈখিক, তা অতীত থেকে ভবিষ্যতে বয়ে চলে, সব সময় একটা পরিণামের দিকে—কারণ ভোগবাদী, কাজ-আঁকড়া সমাজে ক্রমাগত সময়কে হিসেব করে চলেছে নিজের চেষ্টার সাফল্য বা ব্যর্থতা দিয়ে। পাশ্চাত্যে সকাল হল মানে, ওরেবাপ আরও একটা সকাল চলে এল, আজকের দিনটাকে ঠিকঠাক খাটিয়ে নিতে না-পারলে, উশুল করে নিতে না-পারলে, ফাঁকি পড়ে যাব। এই এক ঘণ্টায় এই জিনিসটা অ্যাচিভ না করতে পারলে, নিজেকে ভালবাসতে পারব না। মানুষের বরাদ্দ সময়টা শুরু হয়ে গিয়েছে, 'ইওর টাইম স্টার্টস নাউ', আর তা দ্রুত শেষ অঙ্কের দিকে চলেছে, হুড়হুড় করে কলের জলের মতো

ফুরিয়ে আসছে, এ ছাড়া সময় সম্পর্কে অন্য ধারণা নেই। আর প্রাচ্যের অত তাড়া পড়ে যায়নি। তার সময়কে সুদে-আসলে ভোগ করে নেওয়ার দায় নেই। তার কাছে সময় একটা প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, একজন বন্ধু, যে সঙ্গে আছে। সময়ের টুঁটি চিপে যথাসম্ভব বস্তুগত সাফল্য আদায় করে নেওয়ার কোনও হুলিয়া সে নিজের পেছনে লেলিয়ে দেয়নি। তার আত্মার মধ্যেই ওইভাবে জীবনের সার্থকতা হিসেব করার প্রতি একটা প্রবল প্রত্যাখ্যান আছে।

ফলে এখানে একটা সকাল অন্য অন্য সকালের মতোই আরও একটা সকাল, লিমিটেড বরাদ্দ জিনিসের পরবর্তী কিস্তি নয়, এখানে সব জিনিস সব ঘটনাপ্রবাহ হইহই করে লাভ বা ক্ষতির পরিণামের দিকে ছুটছে না। বরং প্রাচ্য নিজমনে চুপ করে বসে আছে সময়ের একটা গোলচে মন্থর প্রবাহের ভেতর, যেখানে এ-ওর গা চাটতে থাকা ঢেউয়ের মতো গত-এখন-আগামী প্রায়ই এগিয়েপিছিয়ে জায়গা বদল করছে। যেখানে হাজার বছর ধরে একটিই কুবো পাখি ডেকে ডেকে ঝাঁ ঝাঁ মধ্যাহ্নের বুক চিরে দিচ্ছে। হেথা একই বটগাছের তলায় অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ তিন বুড়োই হাঁটুতে মাথা রেখে ঝিমোয় ও একই গল্প ফের আরম্ভ করে। তাই প্রাচ্যের সময় অনেক অলস, ভাবুক। শাঁখডাকা সন্ধের মতো বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে সে নিজের সঙ্গে নিজেই কথা কয়। পাশ্চাত্যের মতো যুক্তিবাদ আর ভোগবাদ মিলিয়ে একরেখ সময়ের যাত্রায় প্রত্যয় তাই প্রাচ্য-

মানুষের নয়, বরঞ্চ অনেকটা জাদুবিশ্বাস আর নীরব পর্যবেক্ষণ তাকে শিখিয়েছে নিজের ল্যাজ গিলতে থাকা সাপের মতোই সময় প্রায়ই উগরে দেয় ফেলে আসা বেলা, ফিরিয়ে দেয় পরিত্যক্ত কুঠুরি, আর কখনও আগ বাড়িয়ে দেখিয়ে দেয় যা এখনও আসেনি, তাকে। প্রাচ্যের সিনেমার মধ্যেও সেই নির্যাসটাই থাকে। তাড়াতাড়ি করে ক'ঘণ্টার মধ্যে লোককে পদে পদে সমূলে চমকে দেওয়ার, এবং হাত কচলে 'একটুও একঘেয়ে লাগেনি তো? আপনাকে গোটা সময়টা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ দিয়ে উপযোগিতায় কোনও ফাঁক রাখিনি তো?' এঁটো হাসি হাসার কোনও কন্যাদায় তাকে গ্রাস করেনি। সে চরিত্রদের ছোট ছোট কাজকে, সন্ধেবেলায় ঠাকুরকে ধূপ দেখানোকে, চুপ করে নিজের বুকে স্টেথোস্কোপ দিয়ে শুয়ে থাকাকে প্রবল মর্যাদা দেয়। প্রতিটি শট দোহন করে অ্যাকশনে ঝাঁপিয়ে পড়ার তাড়নাটাই সে বোঝে না। নিস্তরঙ্গ পুকুরের ওপর একটা গোটা ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর প্রবাহিত হচ্ছে, তার কোমল সৌন্দর্য ও আনন্দস্রোত তাকে অধিক সম্মোহিত করে। জলফড়িঙের নাচকে তাই ন্যারেটিভে অপ্রাসঙ্গিক, গল্পছুট হিসেবে সে দ্যাখে না। তার কাছে ফড়িঙের দোয়েলের জীবন আর গ্রামের বালক বালিকার জীবন মিলেমিশে আছে।

এখানে এরই সঙ্গে যুক্ত আরও একটা ব্যাপার বলা যায়। প্রাচ্য অবসানে বিশ্বাস করে না। কোনও অবসানেই নয়। জীবনের প্রোজেক্টে সফল না হলেই যেমন এখানে প্রাণের আনন্দের অবসান হয়ে যায় না, নিজেকে মূল্যবান ভাবার অবসান হয়ে যায় না—শুধু বেঁচে থাকা, নিজের আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে, বা গাছপালা কাকজ্যোৎস্নার মধ্যে বেঁচে থাকাই, জানলা দিয়ে স্তব্ধ বাইরে তাকিয়ে থাকাই ক্ষণে ক্ষণে অনেকটা করে মোহর দিয়ে যায়—তেমন মৃত্যুও এখানে শেষ বলে গৃহীত হয় না। একটা লোক মরে যায়, কিন্তু তার আলতামাখা পায়ের ছাপ যুগ যুগ ধরে ওই ঘরে জেগে থাকে। 'পথের পাঁচালী'-তে ওরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে দাওয়া দিয়ে যে সাপ ঢুকে আসে, বাস্তুসাপ, তাকে দেখে একজন আনপড় লোক চেঁচিয়ে উঠেছিল না, 'ওই যে, দুগ্গা ফিরে এসেছে!', সে প্রাচ্যের আদত প্রতিনিধি। প্রাচ্যের মানুষ জানে, আবার আসছি, বা কোনও না কোনও ভাবে থেকে যাচ্ছি, বংশধরের মধ্যে, বা হয়তো পরজন্মে ওইখানে পাখি হয়ে, বা আমার কণা দিয়ে যা কিছুকে সঞ্জীবিত করেছিলাম—তাদের মধ্যে। তাই ইন্দির ঠাকরুণ মরে যাওয়ার আগের দৃশ্যে ঘটি থেকে জল খাওয়ার পর কিছুটা জল গাছের মাথায় দেন। তিনি মরতে যাচ্ছেন, কিন্তু নিজের তৃষ্ণার জল দিয়ে তিনি এই পৃথিবীর জীবনকে লালন করতে ভোলেন না। এই রিচুয়াল আমাদের জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে। 'ভুক্তাবশেষ পশুকে দিও' এই উপদেশের স্নিগ্ধ করাঙ্গুলির স্পর্শ আমাদের মাথায় আছে। এবং সত্যজিৎ হাঁটু গেড়ে বসে এই মাটির ধুলো মেখে তাঁর হৃদয় ও ক্যামেরা দিয়ে আমাদের অবলোকন করেছেন। বারেবারে।

অবশ্য এ সব কথার আর কোনও মানে হয় না। কারণ সে প্রাচ্য আর নেই। থেবড়ে বসে থাকাকে এখন ক্যাবলামি ছাড়া আর কিছুই ভাবা হয় না, আর গাছে খামোকা জল ছেটালে তা কর্পোরেশনের চক্ষুশূল হতে পারে। সময়ও অবশ্যই একরৈখিক, কাউন্টডাউন শুরুও হয়েছে, টায়ে-টায়ে স্কোরও রাখা চলছে। এখন মোটামুটি ভাবে গোটা বিশ্ব একই প্রবণতা ও তাগিদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এবং ওই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিভাজন গা-জোয়ারি সেমিনারগিরি ছাড়া আর কিছুই নয়। সে জন্যও, আর আমরা পণ্ডিতির অপরিচিত এলাকায় বেশি ফাটকাবাজি করতে গেলে অবিলম্বে ধরা পড়তে পারি এই ভয়ে, বোদাভাবে প্রাচ্য টাচ বলতে যা বুঝি, ক'খানা নমুনা জোগাড়ের ব্যবস্থা দেখি।

'অরণ্যের দিনরাত্রি'-তে সবে ওরা চারজন বাংলোটা অধিকার করে ঘোরাফেরা করছে, রবি ঘোষ খবরের কাগজ পুড়িয়ে দিয়ে 'সভ্যতার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ' ঘোষণাও করেছেন, এই সময় ঘুম ভেঙে শমিত ভঞ্জ উঠে আসেন। 'কী রে, ঘুম হল?' 'আর ঘুম! এক ব্যাটা ভোমরা মাইরি কনস্ট্যান্ট কানের সামনে বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ করে চলেছে।' শুনে সৌমিত্র এগিয়ে এসে জিগ্যেস করেন, 'তোর ঘরে কি আবার ভ্রমর-টমর আসতে আরম্ভ করল না কি?' আর শুভেন্দু অনেক আগে থেকেই 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে' শিস দিতে শুরু করেছেন। শমিত ভঞ্জ কিচ্ছুই বুঝে উঠতে পারেন না। এরা এতে হাসির কী পেল, ভেবে ধাঁ হয়ে থাকেন। এবং নিশ্চিতভাবেই, পাশ্চাত্যের দর্শকও। লক্ষণীয়, পরে মেমোরি গেম-এর সময় কাবেরী বসুর জন্য বালিশ আনতে শুভেন্দু যখন উঠে আসবেন ঘরে, বালিশ নিয়ে আবার ফিরে যাবেন আয়নায় চুলটা একটু সেট করে নিতে, তিনি গুনগুন করবেন এই রবীন্দ্রসঙ্গীতটাই!

চারুলতা-র এক সন্ধেবেলা, ব্রিটেনের নির্বাচনে লিবারালদের জয় সেলিব্রেট করতে ভূপতির বাড়িতে সবাই জড়ো হয়েছে, গান হচ্ছে, গল্পগুজব। এর আগের দৃশ্যে চারু অনেকটা এগিয়ে এসেছে অমলের কাছে, তার শার্টের হাতা চোখের জলে ভিজিয়ে দিয়েছে। ভূপতির ঘরের উৎসব থেকে চারু আর অমলের সান্ধ্য আলাপে সত্যজিৎ কাট করেন অনেক পর, যখন রামমোহন রচিত 'মনে করো শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর' গানের শেষ দুটো শব্দ 'সত্যেতে নির্ভর' বারে বারে উচ্চারিত হচ্ছে, শেষ তিনবার ওই কথা আমরা শুনি যখন অমলের মুখে ক্যামেরা ধরা। অমলের ওই গান শুনে রামমোহনের কথা মনে পড়ে, কয়েকটা কথা চারুর সঙ্গে ওঁর বিষয়ে হয়, তারপরেই, 'কথোপকথন যাতে নিছক প্রলাপে পর্যবসিত না হয়', আসলে যাতে কোনওভাবেই একঘেয়ে ব[illegible] না হয়ে ওঠে, সত্যজিৎ এক আশ্চর্য অনুপ্রাসের খেলায় [illegible] বেঁধে দেন। সব কথাই 'ব' দিয়ে হয়। এই ভাবনা শুধু [illegible] ক্ষমতাবান একজন চিত্রনাট্যকারই ভাবতে পারেন, কিন্তু অমলের নজরের বিষয়টা অন্য। সংলাপগুলো এরকম—

চারু : ...আগে বর্ধমান যাও, তারপর তো বিলেত, তাই না? কী গো?

অমল : উঁহু! আগে বর্ধমান, তারপর বিয়ে, তারপর বিলেত।

চারু : তারপর?

অমল : তারপর ব্রিস্টল

চারু : তারপর, ব্যারিস্টার। তারপর?

অমল তারপর ব্যাক টু বেঙ্গল—[illegible] নেটিভ, বাপ বাপ বলে—কেমন? (হাতে একটা বই তুলে নেয়।

চারু : বেঙ্গল? ব্যস?

অমল অ্যান্ড বঙ্কিম—বাবু বঙ্কিমচন্দ্র বায়রন টু বঙ্কিম। 'বিষবৃক্ষ'...(যেন নিজের মনে বলে।

চারু : আর বউঠান?

অমল : (বই থেকে পড়ে, বিড়বিড় করে। যা দেবী মম গৃহেষু পেত্নীরূপেণ...

চারু : বউঠান বাজে? বিশ্রী? বেশ—

এর মূল মজাটাতে প্রবেশাধিকারই কোনও পাশ্চাত্য দর্শকের নেই। পাশ্চাত্য দর্শক কেন, [illegible] কোনও মানুষেরই নেই। কত যে কথা বলা আছে এই [illegible] সংলাপে! চারু অমলের বিয়ের কথাটা এড়িয়ে বিলেতের কথাটা আগে বলেছিল, এদিকে শ্বশুর অমলকে বিলেত পাঠাবে তার মেয়েকে বিয়ে করলে তবেই। অমল সেই অপ্রিয় কথাটি সরাসরি উচ্চারণ করে। এও বোঝা যায়, বিলেত গিয়ে মাথা ঘুরে যাওয়ার ছেলে সে নয়। নিজের এবং ভারতীয়দের ঠিকঠাক অবস্থানের কথা তার ভালই জানা। এবং ফের আসে বঙ্কিমের প্রসঙ্গ, যে বঙ্কিম চারু আর অমলের মাঝখানে সেতু। ওরা দু'জনেই বঙ্কিম-ভক্ত। 'বিষবৃক্ষ' নামটায় শুধু 'ব'-এর খেলা দারুণভাবে আছে তা-ই নয়, এতেও বলা আছে অবৈধ প্রেমের গল্প, যার ফল হয় বিষময়। চারু তার না-পেরে সরাসরি

নিজের প্রসঙ্গটা তোলে, কিন্তু 'বেহায়া'র মতো একটা মোক্ষম বিশেষণে এসে লজ্জায় থেমে যায়, কারণ তার মনে পড়ে যায় আগের দৃশ্যের কথা, যেখানে অমলের জামা আঁকড়ে কাঁদার সময় তারা প্রায় শারীরিক ঘনিষ্ঠতায় এসেছিল। গোটা সিকোয়েন্সটা অন্ধকারে থমথম করছে, এই সময়েই উমাপদ তার বিশ্বাসঘাতকতার শেষ কোপটা মারছে, চারু চাইছে সম্পর্কটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, আর অমল একরকম রসিকতার আড়ালে এড়িয়ে যেতে চাইছে ব্যাপারটা, আর একটু পরেই ভূপতি জানতে পারছে—বন্ধুর মুখ থেকে—নামজাদা পত্রিকায় তার বউয়ের লেখা বেরনোর কথা। এবার, 'ব'-এর খেলা না বুঝলে, কারও মনেই বা পড়বে কী করে, ছবির নাম দেখানোর সময় চারু একটা রুমালে সেলাই করছিল 'B' অক্ষরটা, যা ইংরেজিতে 'ভূপতি'-র আদ্যক্ষর? এবং এ-ও, কথার খেলা এ ছবিতে দেওর-বউদির এই প্রথম নয়। অনেক আগে, চারু-অমলের গল্পগাছার প্রথম দৃশ্যে, অমল ক্লান্ত ও বোর হওয়া গলায় আড়মোড়া ভেঙে বলেছিল, 'পড়াশোনা নেই, পরীক্ষা নেই, প্রফেসর নেই, প্রক্সি নেই...'। চারু : 'কী আছে তবে? পাগলামো? আর পাকামো?' অমল 'পোয়েট্রি...'। এ আসলে দাদার আদেশে বৌঠানকে সাহিত্যে উদ্বুদ্ধ করারই ভূমিকা। যা থেকে সাংঘাতিক আকর্ষণ পরে উপজাত হবে। এই খেলার সময় ঘরময় ছিল রোদ্দুর। আর এখন, অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

চারুলতা-য় বঙ্কিমকে জুড়ে দেওয়ার রকম নিয়েও নিবন্ধ লেখা যায় বই কী। চারু প্রথমে একলা ঘুরতে ঘুরতে গান গায় 'বঙ্কিম, বঙ্কিম', অমল এসেই বলে, 'আনন্দমঠ পড়েছ বৌঠান?' চারু পরে বলে তার মন্মথ দত্ত-র লেখা ভাল লাগে না, বঙ্কিমবাবুর লেখা ভাল লাগে, ভূপতি অমলকে ব্যঙ্গের সুরে বলে তার এক বন্ধু বঙ্কিমের নভেল পড়ে তিন রাত ঘুমোতে পারেনি, এদিকে সাত ঘণ্টা ঘুম তো মানুষের বরাদ্দ, অমল দাদার আনা বিয়ে ও বিলেতযাত্রার প্রস্তাব প্রথমটা প্রত্যাখ্যান করে স্রেফ 'মেডিটেরেনিয়ান' এই শব্দঝঙ্কারের চেয়ে 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং'-এর মূর্ছনাকে প্রাধান্য দিয়ে। যে লোক বঙ্কিম বিষয়ে কিছু জানেন না, বঙ্কিম যে এই ছবিতে দেখানো সময়ে তাঁর খ্যাতির মধ্যগগনে—এ বিষয়েও কোনও ধারণা রাখেন না, তিনি এই সব সংলাপের কী মাথামুণ্ডু বুঝবেন? কী করেই বা বুঝবেন ভূপতির কাগজের স্লোগান 'Truth Survives' আর ওই 'সত্যেতে নির্ভর' কোনখানে এসে মিলছে, এবং তাই কীভাবে উমাপদর বিশ্বাসঘাতকতা ও অমলের সম্ভাব্য বিশ্বাসঘাতকতার সমীকরণ ওই দৃশ্য থেকেই গড়ে তোলা হচ্ছে?

ছবিতে ছবিতে অসংখ্য গুনগুনে গানের টুকরো, নৌকোয় 'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী, বলো কোন পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী' আবৃত্তি আর 'তুমি হাসো শুধু মধুরহাসিনী' বলার পর বুড়ো মাঝির অপূর্ব হাসি, 'আপনার কি শাস্তি হবে জানেন তো? তিনদিনের জেল আর সাতদিনের ফাঁসি' কিংবা বুক-পেট-কোমরের মাপ সবই ছাব্বিশ শুনে 'আপনি কি শুওর না কি মশাই?' গোছের সংলাপে বাংলা সাহিত্যকর্মের রেফারেন্স, 'গিরিশ ঘোষের পসার গেল, এ অভিনেতার জুড়ি নেই' বলে একইসঙ্গে পিরিয়ডটাকে ফুটিয়ে তোলা ও বাংলার সাংস্কৃতিক ছবির কিছুটা উন্মোচন, 'ব-য়ে কাঠি ঘ-য়ে কাঠি ঢোলে কাঠি' এই অত্যাশ্চর্য বাংলা বাক্যে বাঘা-র আত্মপরিচয়দান, যা পৃথিবীর আর কোনও ভাষায় অনুবাদ-সম্ভাবনাহীন, সোমনাথের নারী-ভেট খোঁজার শেষ-ভরসা দালালের দুষ্ট রাবণ দ্বারা সীতাহরণের কাব্য পড়তে পড়তে উঠে আসা, এ সব লাখখানেক ব্যাপার আর বললাম না। সকলেই জানেন। 'তোমার চোখে কী আছে বলো তো?' মেয়েটি আলোকিত মুখে বলে, 'কাজল'। তার পূর্ণতা ও নির্বাপণের কারণটির নামও হবে কাজল, এ জিনিস যে আমরা মাতৃভাষায় পেয়েছি, mascara সাবটাইটেল দেখে ফিরে আসতে হয়নি, এ বড় ভাগ্য। পাঁচ বছরে বাবার টিকিটিও দেখা যায় না শুনে 'বাবার বুঝি টিকি থাকে?' ডায়লগ এ গ্রহে আর কে লিখতে পারতেন? কিন্তু না—এর জন্যেও—তবে শুধু এর জন্যেই না, যা থাকলে বিশ্বের সেরা পরিচালকদের সঙ্গে এক সিংহাসনে গ্যাঁট হয়ে বসা যায়, তার জাত আলাদা। বরফির জাদুর জেরে হাল্লার রাজা মহা হিংস্র হয়ে উঠে বর্শার নিষ্ঠুর আঘাতে আঘাতে খড়ের পুতুল ছিন্নভিন্ন করতে থাকেন, তারপর গুপীর গানে সে ঘোর কাটতে তিনি চোখে জল নিয়ে 'নাআ-নাআআ' বলে আর্তনাদ করছেন যখন—গুপীকে গাধার পিঠে চাপিয়ে বের করে দেওয়ার মিউজিকটা সত্যজিৎ রিপিট করে দেন। রাজা ও সাধারণ প্রজার চূড়ান্ত অপমানের কাহিনি দু'টো, মানবিকতা ও স্বতঃস্ফূর্তি দলে দেওয়ার দু'রকম আখ্যান, এক ধাক্কায় একাসনে এনে দেন। এটাই প্রাচ্যতা। শুধু এই প্রয়োগের সাক্ষাৎ ম্যাজিকে সিনটা ঝিকিয়ে ওঠে না, এই অপার দরদটাতেও চিকচিক করে।

ঋত্বিক বলেছিলেন 'অপরাজিত'-র অপুকে কালপুরুষ দেখানোর মধ্যে প্রাচ্যের মিথের অসামান্য প্রয়োগ আছে, সে তো বটেই। ঋত্বিক লিখছেন 'ভারতীয় দর্শন উপনিষদে আছে কালপুরুষ যাকে ভর করে সে ঘরছাড়া হয়। ছবিতে যেমন জলের মধ্যে কালপুরুষের ছায়া দেখে অপু বলে কা ল পু রু ষ। সেই চূড়ান্ত মুহূর্তে চলচ্চিত্রের শিল্পসত্তা এক গভীরতায় প্রবেশ করে।' কিন্তু হরেদরে সত্যজিৎ মিথকে ঋত্বিকের মতো অত গুরুত্ব দেননি। উপকথাকে, আলপনাকেও নয়। উনি যে জিনিসটা আত্তীকরণ করেছেন, তা হল প্রাচ্যের মূল প্রবণতা। এমন এক স্নিগ্ধ ক্ষমা, প্রশ্রয় ও মানব-সমঝদারি নিয়ে উনি চরিত্রগুলোকে দেখেছেন, যা প্রাচ্যের বুক-ধুকধুকির ধ্রুবতান। 'আহা, থাক না' বলার মধ্যে যে আশ্রয়, পরাজিতের প্রতি যে এক গ্লাস জলের সঙ্গে দু'টো মিষ্টিও এগিয়ে দেওয়া, করতল তুলে আঘাত নিষেধ করার যে ভঙ্গি, সেটা ওঁর সেলুলয়েডের রিল-এ লেখা আছে।

মিউজিক রিপিটের আরেক রোমহর্ষক কাহিনি হল ঋত্বিকেরই দেখানো সেই 'অপরাজিত'-র গোড়ায় 'পথের পাঁচালী'র থিম মিউজিক বসিয়ে দেওয়া। যেখানে সর্বজয়া বহুদিন পর বাংলার গ্রাম দেখতে পান ও আগের ছবির থিম মিউজিক সহসা বাংলার পল্লীস্নিগ্ধতার ও ফেলে আসা দিনের আনন্দের ও মনকেমনের থিম মিউজিক হয়ে যায়। (এই মর্মে আরও একবার 'অপরাজিত'-য় 'পথের পাঁচালী'-র থিম মিউজিক বসানো আছে, ইন্সপেক্টর আসার পর অপু যখন 'কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল' রিডিং পড়ে, আর 'অপুর সংসার'-এও ওই থিম মিউজিক প্রয়োগ করা হয়, অপু যখন আত্মজৈবনিক উপন্যাস লেখার উদ্ভাসিত পরিকল্পনা বন্ধুকে শোনায়)। কিন্তু তার চেয়েও তীব্র বাঙ্ময় ও অবিশ্বাস্য সাংঘাতিক, অলৌকিক কাণ্ড ঘটান সত্যজিৎ, যখন 'অপুর সংসার'-এর শেষ শটের আগের শটটায়, কাজল যখন ছুটতে ছুটতে অপুর কাছে চলে আসে, আর অপুও দু'হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে তাঁকে কোলে তুলে নেয়—পিছনে বেজে ওঠে দুর্গা মারা যাওয়ার পর সর্বজয়ার কান্নার মিউজিক। অপুর জীবনের প্রথম বেদনা, চরম বিচ্ছেদের সঙ্গে, অপুর সাম্প্রতিকতম প্রাপ্তিকে, মিলনকে, ঈশ্বরের মতো লীলায় গ্রথিত করে দেওয়া হয়। চলচ্চিত্রকার বলেন, একটি অবসান কখন যে মিলে যাবে আরেক সূচনায়, আমরা কেউ জানি না। এই বিরাট জীবনের কোন নকশা কোন ফোঁড় আজ বিসদৃশ, অসহ, কিন্তু একদিন স্নিগ্ধ শুশ্রূষা ঝরে পড়বে কোন অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে, বিশাল নকশিকাঁথার আরেক প্রান্তে অপূর্ব আঁকবাঁক এসে পূর্ণ করবে, সমঞ্জস করবে ওই চ্যুতি। এই সান্ত্বনা নিরন্তর জেগে থাকে বলেই জীবন করুণাধারাস্নাত, অবসানহীন। এর চেয়ে বড় প্রাচ্যতা আর নেই।

ঋণ দিলীপ মুখোপাধ্যায়-এর বই 'সত্যজিৎ', অ্যানড্রু রবিনসন-এর বই 'দ্য ইনার আই'।

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জয় গোস্বামী

আজ বলব দাম্পত্যের কবিতা নিয়ে দু-চার কথা। কবিতা নিয়ে কোনও কথা বলতে গেলেই আমার যেমন একবার শঙ্খ ঘোষ মনে পড়েই, আজও তেমন পড়ছে, 'নিহিত পাতালছায়া'র কয়েকটি লাইন : প্রতি রবিবার তুমি নিজের মনের মতো সাজিয়েছ বাড়ি/আর কত দেরী আছে ভেবেছ আলতো ঠোঁটে গুনগুন গান/শুধু আমি কোনও দিন সময়ে ফিরি না/ঘর জুড়ে বেজে ওঠে টান...

স্বামীর বাড়ি ফিরতে দেরি করা আর ঘর জুড়ে এই যে 'টান' বেজে ওঠা, এটা যদি কোনও নারীর দিক থেকে দেখি, তা হলে এই কবিতাটি মনে পড়ে আমার

পাখির সঙ্গে
পাখি এক পাখি দুই
কংক্রিটের ঘরে এক পাখিলতা প্রহরী আমার
সারাটা দুপুর একা সন্ধে একা ভাবি বয়ে যাব
ভাবি নষ্ট মেয়েদের মতো ইশারা ছড়িয়ে দেব জানলায়
রাত্রি দশটায় বাড়ি আসবে যে মানুষটা রাজ্য জয় করে
ভাবি তাকে শাস্তি দেব ফচকেমি করে
কাচের সম্ভ্রান্ত ঘরে ঢিল ছুড়ে মেরে
সাজানো জীবনটাকে এলোমেলো করে ওকে বুঝিয়ে ছাড়ব
দেখো, আমিও মানুষ
আমিও তরুণী আজও
আমারও জঙ্গল ভাল লাগে

পাখি এক পাখি দুই
দুলে দুলে ঘণ্টা নেড়ে আমার মরণজেদ হাল্কা করে দেয়

সকালে কলেজ এক বিশ্রী কাজ, ভাবি ছেড়ে দিয়ে
গুজরাটি গ্রামে গিয়ে এক মাস থাকি
কাচফুলে রংফুলে রৌদ্রময় নকশার বিরাট চাদরে
শাদা শাড়ি পরে আমি নেচে উঠতেই
চারিদিকে ঘন হবে গাছ
দেবতারা ঝুঁকি মেরে বিস্ময়ে দেখবে
রুইতন হরতন ইস্কাবন চিড়ে।

পাখি এক পাখি দুই, দুলে উঠে বলে—
ওই তোর বর এল রাজ্য জয় করে।
মল্লিকা সেনগুপ্ত

কবিতার এই মেয়েটি স্বামীর জন্য একা একা অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে উঠছে। অভিমান আর রাগ ঘন হয়ে উঠছে জীবনসঙ্গীর প্রতি। এভাবে সারা দিন একা একা কাটাব বলে একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি নাকি আমরা? এই একসঙ্গে থাকাটাই তখন বিয়ে-করা। এ কবিতাটি যখন রচিত, আজ থেকে প্রায় দু'দশক আগে, তখনও তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এখনকার মতো আইনি-স্বাক্ষর ছাড়া একত্র বসবাস স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি। যারা সারাজীবন দু'জন দু'জনের সঙ্গে কাটাতে পারব কি না এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে না, তারাই ভাবে, এখন কিছুদিন একসঙ্গে থেকে দেখি। সুবিধে হলে জীবন কাটাব। নইলে আলাদা হয়ে যাব। এটা ভাল উপায়। কিন্তু, যারা মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে—তারা আজও আইন-স্বাক্ষর করেই বসবাস করে। আমি তো তোমার সঙ্গেই থাকব ঠিক করেছি। তারপরেও বাড়ি ফিরতে এমন দেরি করার কী মানে! পাখিলতা আমার প্রহরী। একরাত্রি নিঃসঙ্গ কাটানোর একটি কবিতায় প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত লিখেছিলেন, আমার সঙ্গী নেই কেউ/আছে টেলিফোন। এখানে টেলিফোনের বদলে পাখিলতা। পাখি এক, পাখি দুই দিয়ে কবিতাটি শুরু। ঘর সাজানোর নানা জিনিস পাওয়া যায় দোকানে। তাই দিয়ে মেয়েটি সাজিয়েছে তার সংসার। হয়তো নতুন সংসার। 'প্রতি রবিবার তুমি নিজের মনের মতো সাজিয়েছ বাড়ি'—এই লাইনটি এবার, পরবর্তী কালের এক মেয়ের জীবনে সত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে—যদিও এটা রবিবার কি না সেটা আমরা জানি না, সেটা জানা জরুরিও নয়। এখানে মেয়েটির অপেক্ষাই কবিতার বিষয়।

এই ঘর সাজাবার পাখি আমরাও দেখেছি পড়শি-বাড়িতে। ঘণ্টা লাগানো পাখিরা এক দুই তিন করে চমৎকার পাটের রঙিন দড়ি-সুতোয় ঝুলে থাকে। হয়তো বুকসেলফের সামনে। হয়তো ছাদের কাছ থেকে টাঙানো। অবিকল কীরকম এই পাখির গুচ্ছ, তা না-জানলেও, আন্দাজ করা যায় কাঠের তৈরি অথবা প্লাস্টিকের। এই রংচঙে পাখিগুলো জানলা দিয়ে হাওয়া এলেই দুলতে থাকে। আর হয়তো টুংটাং করে ঘন্টি বেজে ওঠে ওদের দুলুনিতে। ভারী সুন্দর কোমল এক জলতরঙ্গের মতো ঘণ্টাধ্বনি ওঠে।

এই দোদুল্যমান পাখিরা, এবং কোমল ঘণ্টাধ্বনিই মেয়েটির অপেক্ষার একমাত্র সঙ্গী। স্বামী কাজ থেকে ফিরতে দেরি করছে, মেয়েটির রাগ বেড়ে দুঃখে আবার দুঃখ বেড়ে গিয়ে রাগে যাতায়াত করছে। মেয়েটির জীবনতথ্যও একটি অর্ধপংক্তিতে বলা আছে। 'সকালে কলেজ এক বিশ্রী কাজ।' অর্থাৎ সকালে তাকে কলেজে যেতে হয়। 'বিশ্রী কাজ' কথাটি বোঝায় এই মেয়েটি ছাত্রী নয়। তাই এই কাজ ছেড়ে দিয়ে গুজরাটি গ্রামে চলে যাওয়ার কথা ভাবে। পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার কথা কেউ ভাবে না সচরাচর। কিন্তু, চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা প্রায়ই ভাবে। যদিও বাস্তবে করে উঠতে পারে না, কিন্তু ভাবে তো। তা ছাড়া আগেই মেয়েটি বলেছে, আমিও তরুণী আজও। ছাত্রী হলে, নিজেকে 'আজও তরুণী' বলে দাবি করতে হত না। অর্থাৎ তুমি যে এত দেরি করছ বাড়ি আসতে, আমি কি আর তরুণী নই মনে করো? এ সব হল অভিমানের ভাবনা। মেয়েটির সারা দিনের অপেক্ষার মধ্যে মধ্যে, ভাবনার মধ্যে মধ্যে, ওই পাখিগুলো দুলে দুলে উঠছে হাওয়ায় আর ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে, ওরা সেই হিসেবে প্রায় ঘড়ির মতো, কিন্তু ঘড়ি নির্দিষ্ট সময় অন্তর শব্দ করছে। আর এই পাখিলতারা হাওয়া এলেই শব্দ করে। আর হাওয়া তো যখন ইচ্ছে আসছে যাচ্ছে। কিন্তু বরের বাড়ি ফেরার নাম নেই। এই কবিতায় 'প্রহরী' শব্দটি ভারী মজার। একা বউকে বাড়ি রেখে গিয়েছ—প্রহরী কারা? না, ওই পাখিগুলো। যারা কাঠের বা প্লাস্টিকের পাখি। কিন্তু 'পাখিলতা' শব্দটিতে এক সৌন্দর্য আসে। পাখিগুলো দড়ি-সুতোয় বাঁধা, ফলে তারা যেন লতা। ঘরের লতানে গাছ। দ্বিতীয় লাইনে এই পাখিলতার মধ্যে গাছ আর পাখিকে ডেকে আনা হয়েছে কংক্রিটের ঘরে। ধরা যাক শহরে। আর এই একা একা অপেক্ষারত বধূটির মনে ধীরে ধীরে রঙিন অরণ্য জন্মাল। কবিতাটির শেষ প্রান্তে যেতে যেতে আমরা

দেখলাম ওই শহরের দুপুরবেলায়, ওই কংক্রিটের ঘরে কী কী ঘটল। জাগ্রত স্বপ্নের মতো কাচফুলে রংফুলে নকশার বিরাট চাদরে মেয়েটি সাদা শাড়ি পরে নেচে উঠছে—উঠতেই—চারিদিকে গাছপালা ঘন হয়ে এল। ঘন হয়ে আসার মধ্যে প্রিয়-সঙ্গের প্রিয়-নৈকট্যের আভাস। গাছ হল প্রকৃতি-নিবিড় এক মুক্তি। অথচ মেয়েটি কিন্তু একাই সেই মুক্তির মধ্যে চলে গিয়েছে। ওই কংক্রিটের ঘরে অপেক্ষা করতে করতে এক অপরূপ সৌন্দর্যের জগত সে সৃষ্টি করে নিচ্ছে নিজের চারপাশে। তার যে অত রাগ-দুঃখ হয়েছিল একটু আগে, সে যে বরকে 'শাস্তি' দেবে বলে নানা উল্টোপাল্টা ভাবছিল সেই সব মিলিয়ে গেল ওই পাখিদের দুলে-ওঠা ঘণ্টাধ্বনিতে। কেন না বড় শখ করে, আনন্দ করে ওগুলো পছন্দ করে এনে ঘর সাজিয়েছে সে। ওই পাখিদের দেখে তার প্রকৃতি মনে পড়ল। হয়তো তখনও পর্যন্ত অবরুদ্ধ, তখনও-প্রস্ফুটিত-না-হওয়া স্নেহ মনে এল। ওই কংক্রিটের ঘরের মধ্যেই সে একা একা রচনা করল এক সুন্দরের জগৎ, যা দেখবার জন্য এমনকী আকাশ থেকে দেবতারাও ঝুঁকে পড়লেন। ঘর হয়ে গেল স্বাধীন জঙ্গল। অরণ্য-রঙিন এই মুক্তির দিকে মেয়েটির মনকে নিয়ে গেল কয়েকটি ছোট ছোট কাঠের পাখি।

যে পাখিরা আবার ঘণ্টি বাজিয়ে দুলে ওঠে, যখন, অনুমান করা যায়, দরজায় বেল বাজে। পাখিসঙ্গিনীরা একেবারে শেষ লাইনে এসে কথা বলে। বা তাদের মুখ থেকেই আমরা কবিতাটির অপূর্ব সমাপ্তি উপহার পাই 'ওই তোর বর এল রাজ্য জয় করে।' ভালবাসতে পারলে, যে কোনও বন্ধ ঘরেও মানুষ অরণ্য-স্বাধীন মুক্তি আনতে পারে—কাঠের পাখির মধ্যে প্রাণ দিতে পারে, এ কবিতা তারই উদাহরণ হয়ে থাকে।

মল্লিকা সেনগুপ্তের অল্প বয়সের লেখায়, এই ঘর বাঁধার স্বপ্ন প্রথম দেখা দিয়েছিল, এইভাবে :

ঘর
বাঁশের মাচান বাঁধো সঙ্গমের আগে, ঘর হবে
পুত্র বেঁধে নেবো পিঠে

নদী দৃশদ্বতী আজও বইছে সেখানে, পাখি, নতুন উদ্ভিদ।

বৈবস্বত পিতা আমাদের—আশীর্বাদ করো যেন এবারের
শীতে
যাযাবর হয়ে আর বেরিয়ে না পড়ি।

মানুষ যখন যাযাবর ছিল, সে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত। তার নারী, সে আর এভাবে জীবন-জীবিকার খোঁজে বারবার উদ্বাস্তু হতে পারছে না, ঘর চাইছে। ঘর বেঁধে নিতে চাইছে। নতুন স্বামীর কাছে। নতুন কেন? ওই যে, বাঁশের মাচান বাঁধো সঙ্গমের আগে। আগে ঘরের বাবস্থা হোক। মাথা গোঁজার ঠাঁই। তারপর মিলন। এখানে পুত্র বেঁধে নেব পিঠে এই ছবিটিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রূপ মনে আসে। চিরায়ত একটি চিত্র। এ লেখাকে যদি 'পাখির সঙ্গে' কবিতাটির পূর্বভূমিকা হিসেবে ধরে নিই, তবে 'পুত্র বেঁধে নেব পিঠে' এই স্বরসংগতিটিও পরে আরও বিস্তার পায় কয়েক বছর পরের কবিতায়। যেমন এই মোহ

মোহ
এমন একটি মধু সরোবরে ভাসছি
জলতলে যার একটিই নীল মৎস্য
হাসছে খেলছে লেজ নাড়াচ্ছে ছন্দে
জলে বিদ্যুৎ তোলে আসন্ন জন্ম।
একটি পুরুষ আমাকে রেখেছে আগলে
পাঁজর কাঠির শক্ত মধুর বাঁধনে
যেন দুটি হাত ঝড় ও ঝঞ্ঝা ঠেকিয়ে
বাঁচিয়ে রাখবে শ্যামাক ঘাসের মাটিকে
মা ও ছেলের জন্য সাজাবে নৌকো।

গর্ভের মধ্যে যখন সন্তান রয়েছে তাকে আগলে রাখার জন্য মায়ের শরীর-মন যেমন সাবধানী স্নেহে আকুল, তেমনি যে এইবার পিতা হতে চলেছে, তারও দু'টি আকুল ও শক্তিমান বাহু নিজের নারী-শিশুকে আগলে রাখছে প্রাণপণ। এই কবিতার মধ্যেও স্বামীর যে রক্ষাকারী প্রহরী-ভূমিকা, তা স্পষ্ট—যে ভূমিকার জন্ম হয়েছে প্রেম ও স্নেহ থেকে—সঙ্গিনীর নির্ভরতাকে সম্মান ও স্থায়িত্ব দিতে। এর পূর্ণতর একটি রূপ আমরা দেখতে পাই 'জন্মের ঘ্রাণ' কবিতাটিতে। যা 'ঘর' কবিতাটির পরবর্তী চেহারা।

জন্মের ঘ্রাণ
গাজর রঙের জামা থেকে বেরিয়েছে
দুটো মাত্র হাত, তারা গর্ভজননীকে
জীবনবীমার মতো আগলে রেখেছে
হাত এত সাবধানী কখনও ছিল না।

কখনও ছিল না এত তিরতির করা
উদ্বেগ আকুতি তার চোখের মণিতে
আসন্ন জন্মের ঘ্রাণ নিতে নিতে যেন
এই কয় মাসে যুবা বয়স্ক হয়েছে।

যে আছে সে সরোবরে কুণ্ডলী পাকিয়ে
থাকে বাবা ও মায়ের ঠিক মাঝখানে
জলে ঘন অন্ধকার, তাও নড়ে ওঠে
আকাঙ্খা জলের সেই অলৌকিক মাছ।

জল ও মাছের শব্দের কান পাতে তবু
শুনতে পায় না কিছু চকিত যুবক
'আমার মতোই ওর এক কান বন্ধ হবে না তো!'
—বলে সে ডুকরে উঠে কোলে মুখ গোঁজে।

পেটে যেন ধুমধাম ভূমিকম্প হয়
মাছ চুমু দিতে চায় পিতার কপালে
তার মাথা আঁকড়িয়ে ধরে আমি ভাবি
আমরা কি তিনজন বীমা হবে উঠব কখনও?

এ থেকে শেষ চার লাইন যদি দেখি গর্ভজলে সন্তরণশীল শিশুটিকে মাছের কল্পনায় ঠিক এর আগের একটি কবিতাটিতে দেখতে পেয়েছিলেন মল্লিকা সেনগুপ্ত। এবং গর্ভস্থ শিশুর আলট্রাসাউন্ড স্ক্যান করাকে বিষয় হিসেবে ধরে নিয়ে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কেউই কবিতা লেখেননি। সেখানে যে শুশুক বা জলজীব হিসেবে তাকে দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে সে-ই 'মোহ' কবিতার ছোট্ট মাছ, যেন তার এখনও পর্যন্ত না দেখা পিতাকে, মায়ের গর্ভের ভেতর থেকেই হাত দিয়ে জড়াতে চায়। কারণ পিতা তো তার আসন্নপ্রসবা রমণীকে সাবধানে সসংকোচে জড়িয়েছে শিশুকে স্পর্শ করবে বলেই। নারীটিও শিশুস্পর্শ উপহার দিতে চায় বলে এই যুবা শিশুটির মাথা দু'হাতে জড়িয়ে নিয়েছে—স্নেহের ধারা এখানে দ্বিমুখী। শিশুটি জন্মায়নি তখনও, তবু, একটি সম্পূর্ণ পরিবারের স্নেহমমতা নির্ভরতা প্রেম বাৎসল্যের অপরূপ স্বর্গ এই চার লাইনে ফুটে উঠতে চায়। কেবল একটি শব্দ, এখানে স্বর্গের কল্পনাদেশ থেকে এবং তার যাবতীয় ভাবাবেগ থেকে ছিঁড়ে এনে দৃশ্যটিকে দৈনন্দিন বাস্তবের মাটিতে আটকে দেয়। সেই শব্দটি হল 'বীমা'! এইখানেই এ কবিতা আজকের দিনের লেখা হয়ে ওঠে।

লেখার প্রথম দিকেও 'জীবনবীমার মতো' কথাটা এসেছে। নিরাপত্তা, আর্থিক সাবধানতা বা চুক্তির ব্যাপারটা, হিসেবের ব্যাপারটা এই শব্দটি থেকে বড় আশ্চর্যভাবে রূপায়িত হয়। মাত্র একটা শব্দে। আর এই কুশলী শব্দপ্রয়োগ একটি যুগের মানসিকতাকে ধরে ফেলে। জীবন মানে মূলত যেখানে 'বীমা'। সমস্ত সুখ আনন্দ বাৎসল্য প্রেমের সঙ্গে টাকার ব্যাপারটা যে অঙ্গাঙ্গী জড়িত সে-ধারণা কবিতাতে সাধারণত বলা হয় না। এই 'বীমা' শব্দটির প্রয়োগ একটি বাস্তব ও ব্যবহারিক প্রয়োজনের প্রসঙ্গ যুক্ত করে দেয় গভীর আকুলতার পাশাপাশি। এই আশ্চর্যসুন্দর এবং নিভৃত মুহূর্তেও কি এ কথা মনে আসে না যে, সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে টাকার প্রয়োজন! সুরক্ষা, নিরাপত্তার প্রয়োজন? এই বাস্তব জিনিসটি 'বীমা' শব্দে উপস্থিত থাকে। এই প্রয়োগও সম্পূর্ণ নতুন। এইভাবে পুরো বিষয়টিকে একটি অপ্রত্যাশিত শব্দের মধ্যে দিয়ে অন্য মানসিকতার স্তর থেকে দেখা—যা বাংলা কবিতায় আমরা আগে দেখিনি। উল্টোদিকে ওই তিনজন, মা-শিশু-পিতা, এই তিনজনই আবার পরস্পরের 'বীমা' হয়ে ওঠে। বিমা হল এক ধরনের কনট্র্যাক্ট, সুরক্ষা-নিরাপত্তা সম্পর্কিত কনট্র্যাক্ট—আর আমাদের একান্ত সম্পর্কগুলোও যে আসলে কোথাও এক ধরনের কনট্র্যাক্ট—এ কবিতা, এই বিশেষ যুক্তিনিষ্ঠ বাস্তব বিষয়ে আমাদের সচেতন করে। আজকের সমাজের যে জীবনযাপন তার একটি বিশেষ ধরনের মনোভঙ্গি সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করে। এইভাবে—জীবন কী, তার বৈচিত্র কত—তা কবিতা থেকে শিখতে পারি। নারীটি, সেই আদিম জনগোষ্ঠীর নারীটি, যে, ঘর বাঁধতে চেয়েছিল বাঁশের মাচান দিয়ে, পুত্র পিঠে বেঁধে নিতে চেয়েছিল, সে আজকের কংক্রিটের ঘরে, রাক্ষুসে শহরে, নিরাপত্তার খোঁজে ব্যাকুল। সেই পুরাকাল থেকে আজকের দিনে এসে পৌঁছয় নারীটি। যাযাবর অবস্থা থেকে যে ঘর বেঁধে স্থিত হতে চেয়েছে সেই কত যুগ আগে থেকে। এই শহরে একটি সন্তান আসছে, সামনে তাকে বড় করার জন্য কত যুদ্ধ অপেক্ষা করছে কে জানে—তাই সুরক্ষা, তাই বিমা। সেদিনের নবীনা-মাতা থেকে আজকের তরুণী-জননী, সেই একই নিরাপত্তার খোঁজ। এইভাবে এই চারটি মাত্র লাইনেই ব্যক্তিগতকে পার হয়ে, 'বীমা' কথাটির ব্যবহারে, মধ্যবিত্তের মধ্যে যে নিরাপত্তাহীনতা, তার মধ্যে ঢুকে পড়ে কবিতাটি। নিতান্ত আপন পরিবারের আবেগ-মুহূর্ত থেকে শুরু হয়ে তা পৌঁছয় সকলের প্রয়োজনবোধে, সকল পরিবারের কবিতা হয়ে ওঠে। কারণ টাকা বিষয়ক উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা সব মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যেই রয়েছে। সাধারণ মানুষের এই আকুল স্নেহ-আকুলতা, নিরাপত্তাহীনতা ও ভবিষ্য-আশা এখানে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

বাবা-মা-সন্তানের আরেকটি কবিতায় তবে যাই। এ কবিতাটি লিখেছেন মণিভূষণ ভট্টাচার্য

যাপন
বেশ ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, সোয়েটার খুলো না এখন।

এই যে, খেয়াল রেখো দুপুরে সেলুনে যেতে হবে।

এটা কী করেছো, কি-তে দীর্ঘঙ্গি বসাবে মনে করে।

কী পড়বে, ভাবছো কিছু, পরশুদিন কবিসম্মেলনে?

পাখি হলে উড়ে যেতে, পাখি নও এইমাত্র জানি,
পা দুটি বাঁধা-ই আছে লতা দিয়ে, সঞ্জীবনী লতা।
এ সবুজে তৃষ্ণা নেই, আছে শুধু স্নিগ্ধ সমীক্ষণ।

গোলাপজামের ঘ্রাণ টিফিনের বাক্সে পুরে নিয়ে
আমাকে লিখতে বলে ট্রেন ধরতে চলে গেলে তুমি।
ছেলের কলেজ নেই। লেখা থাক। আয় তো দুজনে গল্প করি।

সন্ধ্যার একটু পরে দক্ষিণের দরজা খুলে যাবে।

এ কবিতাতেও একজন প্রতীক্ষা করে বসে আছে। কখন অন্যজন বাড়ি ফিরবে। এবার অপেক্ষারত মানুষটি স্বামী। স্ত্রী গিয়েছেন বাইরে, কাজে। কিন্তু সে-অপেক্ষার কথা আমরা জানতে পারছি, কবিতার শেষ দিকে এসে। তার আগে এক এক লাইনের পর একটি করে স্পেস। লাইনগুলো এক একটি সংলাপ। প্রথম চারটি লাইন। স্বামীটির সমস্ত কিছুতে খেয়াল রাখেন স্ত্রী। বোঝা যায় স্বামী-মানুষটি কিছু-বা আপন-ভোলা। ভুলে যান কীসে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। কিংবা এবার সেলুনে যাওয়া দরকার। এমনকী কবি সম্মেলন কী কী লেখা পড়বেন, তা-ও স্থির করে উঠতে পারেন না। একবার হয়তো ভাবলেন, এইটা পড়ি। পরক্ষণে ভাবলেন, না থাক এটা। ওই দুটো পড়ব'খন। শেষ মুহূর্তে হয়তো সিদ্ধান্ত বদলালেন আবার। এমন মানুষকে একটু দেখে-শুনে না রাখলে হয়? এই স্নেহ-উদ্বেগের স্পর্শ কবিতাটির প্রথমদিকে নরম ছায়া বুলিয়ে যায়। এক এক লাইনের স্পেস হয়তো এ-জন্য যে কিছুক্ষণ পরপর এসে স্বামীকে দেখে যাচ্ছেন স্ত্রী—এমনকী, এই সংলাপগুলো কয়েক দিন পরপরও হতে পারে। এ কবিতাতেও পাখি আছে। লতা আছে। কিন্তু আগের কবিতায় যেমন দড়িতে বাঁধা কাঠের পাখিরা প্রেমের উদ্বোধনে প্রাণ পেয়েছিল, এখানে তেমন নয়। জীবন্ত মানবী যেন প্রায়-পাখি। যদিও, ছদ্ম-বিবৃতিতে বলা আছে পাখি নও, এই মাত্র জানি। অর্থাৎ ভেতরে যে কথাটি রয়েছে তা হল, পাখি নও, কিন্তু পাখির সমস্ত গুণ তোমার মধ্যে। এখানে পাখি কথাটি চঞ্চলতা আনছে না, আনছে স্নিগ্ধতা, কোমল স্পর্শ। আর এখানে যে লতা আছে, 'সঞ্জীবনী লতা', তাও তো ওই মানবী নিজেই। যিনি সারাক্ষণ নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে—ওইজন্য স্পেস, ওই কাজের ফাঁকে ফাঁকে আসার জন্যই—স্বামীর খবর নিয়ে তারপর ট্রেন ধরতে চলে গেলেন, নিশ্চয় চাকরিতে। তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মানে, একটি সুগন্ধের সাময়িক অন্তর্ধান।

অন্তর্ধান? না, তা নয়। এই যে সারাক্ষণ মনে পড়ছে, সকাল থেকে, অথবা গত দু'দিন কী কী বলেছেন তিনি—সেটাই তো তাঁর বাড়ি-থাকা।

শেষ লাইনের আগের লাইন খুবই সাধারণ ভাবে বলা। তবু কেন যেন, পড়া মাত্রই আমার চোখে জল এসে যায়। আয় তো দু'জনে গল্প করি। এই যে সন্তান, সে সদ্যোজাত শিশু নয়। সে বড় হয়েছে, কলেজে পড়ে। পিতাপুত্র যেন দু'ভাই। দুই বন্ধু এখানে। দু'জনে গল্প করছি আমরা বাপ-ব্যাটায়। আসলে কী করছি আমরা? না, তোর মায়ের জন্য অপেক্ষা করছি। বাবা-ছেলের এই সৌহার্দ্যের ছবিটি জেগে থাকে আমাদের মনে। জেগে থাকে সেই অপেক্ষাটিও। যখন অফিস থেকে ফিরবেন সেই নারী, যার জন্য বাবা-ছেলে বসে আছে। তখন দক্ষিণের দরজা খুলে যাবে।

'ওই তোর বর এল রাজ্য জয় করে'। পাখিলতাদের মুখ থেকে শোনা এই কথা যেমন আমাদের দ্রবীভূত করে, নীরব এক আনন্দে ভিতরের পাথর গলিয়ে দেয়—তেমনই এই, 'সন্ধ্যার একটু পরে দক্ষিণের দরজা খুলে যাবে'—লাইনটিও। আমাদের সাধারণ জীবনের মধ্যেও যে অসামান্য সুখ-স্বর্গ তার নিবিড় স্পর্শ নিয়ে উপস্থিত হতে পারে, মল্লিকা ও মণিভূষণের এই কবিতাগুলি আমাদের মনে করিয়ে দেয়। আমাদের মনের ক্ষত যত, ক্ষতি যত তার ওপরে এ সব কবিতা শ্রুশ্রূষার হাত রাখে। এরা আরেকবার বুঝিয়ে দেয় আমাদের সামান্য জীবন আমরা ঘিরে রাখতে পারি নিজেদের মধ্যে থেকে উৎসারিত স্নিগ্ধ আলোয়। যে আলোর নাম পরিবার।

দোজখনামা

রবিশংকর বল

॥ বারো ॥

হর কদম দূরী-এ মনজিল হৈ নুমায়াঁ মুঝ-সে,
মেরী রফ্‌তার-সে ভাগে হই বয়াবাঁ মুঝ সে।
(প্রতি পদক্ষেপে গন্তব্যের সুদূরতা আমার কাছে স্পষ্ট
হয়ে উঠেছে,
আমার চলাকে পিছনে ফেলে জনশূন্য বনভূমি
এগিয়ে চলে আরও জোরে।।)

কেয়াবাত মির্জাসাব, একেবারে নরক গুলজার করে দিলেন। কিন্তু বেনজির ও বদর-ই-মুনিরদের গল্পরা সব কোথায় হারিয়ে গেল বলুন তো? দেখছেন, আমাদের ভাইজানেরা কেমন সব চনমনে হয়ে উঠেছেন, যেন আজিজের হোটেলে আমাদের টেবিলে প্লেটে প্লেটে শাহি কাবাব এল, এবারই তো জমবে মজা, কাবাবে-গাঁজায়-রঙ্গরসিকতায়। সেই সময় আমাদের ক্যাপ্টেন ওয়াহিদ যেন কোন একটা মেয়ের পেছনে পড়ে গিয়েছিল, ভাল কথা, কিন্তু একটা মেয়ের জন্য সবসময় দিবানা ভাব করে বসে থাকার কোনও মানে আছে, মির্জাসাব? ক্যাপ্টেনের সব সময় ভয়, মেয়েটা যদি অন্য কারও সঙ্গে ভেগে যায়। আরে যায় তো যাবে, দুনিয়ায় মাগি কি কম আছে? মাফ করবেন মির্জাসাব, কখন যে মুখ ফসকে কোন শব্দ বেরিয়ে যায়। এইরকম বেফাঁস শব্দ বেরিয়ে পড়লেই, ইসমত সামনে থাকলে, চোখ বড় বড় করে তাকাত, ইসমতই ছিল সেই মেয়ে, যে আমার পাঞ্জাবি ঝাঁকিয়ে বলতে পারত, 'আরে শালা, মাগি কাকে বলছিস রে? তুই কোন মাগির পেট থেকে পড়েছিস?' এ সব অবশ্য কখনও বলেনি। ইসমতের আখলাকির তো তুলনা ছিল না, শুধু ওই চোখ বড় বড় করে তাকানো, তাতেই যা বোঝার বুঝে নাও। যাকগে, ইসমতের কথা বাদ দিন, এরা আবার সবাই আজিজের জাহান্নামের কিস্‌সা শোনার জন্য চুলবুল করছে, দেখতে পাচ্ছেন তো?

তো, একদিন আমাদের ক্যাপ্টেন ঝড়ে-ভাঙা লতার মতো টেবিলে এলিয়ে পড়ে আছে, কয়েক দিন ধরে নাকি মেয়েটার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। কত চাঙ্গা করার চেষ্টা করি, তবু সে শালা কেন্নোর মতো গুটিয়ে পড়ে থাকে, হাসি-মস্করা-খিস্তি কিছুই তাকে ছুঁতে পারে না। এ কোন মজনু রে বাবা, অথচ নাম দ্যাখো, ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন ওয়াহিদ। অনেক চেষ্টার পর কাঁদো কাঁদো মুখে জিজ্ঞাসা করল, 'সাদাতভাই, মেয়েরা কেমন হয় গো?'

—মানে?

—ওরা কি ভালবাসতে জানে?

—তার আমি কী জানি? আমার মেজাজ চড়ে গেল।

—আরে ইয়ার বলোই না—। আশিক আমার পিঠে চাপড় মেরে বলল, 'তোমার সেই বেড়ালের গপ্পোটা ক্যাপ্টেনকে বলে দাও। তা হলে আর সারা জীবন একটা মেয়ের পিছনেই ল্যাং ল্যাং করবে না।'

আশিকের কথায় আমাদের টেবিলে হাসির হল্লা উঠল। ক্যাপ্টেন ছলোছলো চোখে বলল, 'আমি তো মেয়েদের কথা জিগ্যেস করেছি। বেড়ালের কথা আসছে কোথা থেকে?'

—মাস্টোর কাছেই শোনো। আশিক আমার দিকে তাকিয়ে চোখ মারে। মানে, বলো, তাড়াতাড়ি বলো। শালা ক্যাপ্টেনের আশনাই-এর ঝাড়ে বাঁশ যাক। আশিক ছিল সবার পেছনে লাগতে ওস্তাদ।

ক্যাপ্টেনের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললাম, 'দ্যাখো ক্যাপ্টেন, আল্লার কসম খেয়ে বলছি, বেড়াল আর মেয়েদের আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।'

—কেন? বেড়াল তো বেড়াল আর মেয়ে তো মেয়েই। না-বোঝার কী আছে এতে?

—আমাদের বাড়িতে একটা বেড়াল ছিল, বুঝলে। বছরে একবার করে সে যে কী কান্না জুড়ে দিত, কী বলব ভাই। বেড়ালের কান্না শুনেছো তো? মনে হয় যেন পৃথিবীটাই কারবালা হয়ে গেছে। তার কান্না শুনে কোথা থেকে হাজির হত এক হুলো। তারপর দু'জনের ঝগড়া, মারামারি, রক্তারক্তি পর্যন্ত হয়ে যেত।

—তারপর?

—তারপর আবার কী? বেড়াল এরপর চারটে বাচ্চার মা হয়ে যেত। এত কান্না, মারামারির নিট ফল ওই চারটে বাচ্চা।

—তুমি শালা একটা হারামির বাচ্চা। বলতে বলতে ক্যাপ্টেন আবার টেবিলের ওপর এলিয়ে পড়ল। আজিজের হোটেল তখন হাসি-সিটিতে ফেটে পড়ছে।

কিন্তু মির্জাসাব, যতই এই সব টিকরমবাজি করি না কেন, আমার আর ভাল লাগছিল না। জুয়া খেলতে খেলতে যেমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, আজিজের হোটেলের সকাল-সন্ধেগুলোও আমাকে আর কিছু দিতে পারছিল না। কী মনে হত জানেন? আমার তো আসলে অন্য কিছু করার কথা। কিন্তু কী করব? আমি বুঝতে পারতাম না মির্জাসাব। একদিন হঠাৎই ঘড়ির পেন্ডুলামটা উল্টো দিকে ঘুরে গেল। জীবন হয়তো এভাবে না চাইতেই আমাদের অনেক কিছু দেয়, যদি অবশ্য নেওয়ার মতো ক্ষমতা থাকে।

আজিজের হোটেলেই আমার নসিব অন্য দিকে মোড় নিল, ভাইজানেরা। আলাপ হল বারি আলিগ ও আতা মহম্মদ চিহাতির সঙ্গে। আমার চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন এঁরা। মাঝে মাঝে আজিজের ওখানে চা খেতে আসতেন। আবদুল রহমান সাহেব তখন 'মাসাওয়াৎ' নামে একটা কাগজ শুরু করেছেন, বারিসাহেব সেই কাগজেই কাজ করেন। একদিন আজিজের হোটেলে বারি আলিগ সাবের সঙ্গে এক টেবিলে বসেছিলাম। আরও অনেকেই ছিল। হঠাৎ কী প্রসঙ্গে যেন মৃত্যুদণ্ড নিয়ে কথা উঠল। মৃত্যুদণ্ড ঠিক, না ভুল? একজন অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকার কি কারও আছে? আমি বারিসাবকে অনুরোধ করলাম, স্যার, আপনি এ-ব্যাপারে আমাদের একটু বুঝিয়ে বলুন। আমি যদি আপনাকে খুন করি, তা হলে কেন আমাকে হত্যা করা যাবে না? অনেক যুক্তিতর্ক দিয়ে তিনি বোঝালেন, হত্যার বদলে হত্যা কোনও পথ হতে পারে না। শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ডের কোনও নৈতিক ভিত্তি নেই। আর এই সব

কথার মধ্যেই এসে পড়ল ভিক্টর উগোর "দ্য লাস্ট ডে'জ অফ দ্য কনডেমড" বইয়ের কথা। ভিক্টর উগোর নাম আপনার শোনার কথা নয়, মির্জাসাব। ফ্রান্সের একজন সেরা কবি, ঔপন্যাসিক ছিলেন ভিক্টর উগো। আমি তো চমকে উঠলাম। আরে, বইটা তো আমার বাড়িতে আছে। সঙ্গে সঙ্গে বারিসাবকে বললাম, 'বইটা আমার কাছে আছে। আপনি কি আর একবার পড়তে চান?'

বারিসাব অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কী দেখছিলেন, কে জানে! তারপর বললেন, 'কাল বইটা নিয়ে আমার অফিসে এসো।'

সেদিন সারা রাত আমি ঘুমোতে পারিনি, মির্জাসাব। কেমন গর্ব হচ্ছিল। উগোর যে-বইয়ের কথা বারিসাব বলেছেন, বইটা আমার কাছেই আছে আর কাল আমি বইটা ওনাকে দিতে পারব। আচ্ছা, বই তো না হয় দেব, কিন্তু তারপর কী কথা বলব অমন মানুষের সঙ্গে? তিনি কি আমার সঙ্গে কথা বলবেন? ভাবতে ভাবতে আমাদের দু'জনের কত সংলাপই যে তৈরি করে ফেললাম। গল্পও তো এভাবেই আমার ভেতরে জন্ম নিত, মির্জাসাব। এক একটা মুখ ভেসে উঠত, আর তাদের কথাগুলো আমি বুনে যেতাম। কথা বলতে বলতেই চরিত্রগুলো আমার সামনে ফুটে উঠত।

বারিসাব আমাকে একেবারে আপন করে নিলেন। আমি রোজ পত্রিকার অফিসে যাতায়াত শুরু করলাম। তাঁর কথায়, পাণ্ডিত্যে, রসবোধে আমি একেবারে মজে গেলাম। বারিসাবের কথা পরে আমি 'গাঞ্জে ফেরেশ্‌তে' বইতে লিখেছিলাম। অমন একটা মানুষকে তো সারা জীবনেও ভোলা যায় না। একই সঙ্গে বড্ড ভীরুও ছিলেন মানুষটা। কিন্তু তাঁর কথা আর হাসির সামনে একবার পড়লে, জমে যেতে হত। আমার ভেতরের অস্থিরতা বুঝতে পারতেন বারিসাব। আমাকে উর্দু সাহিত্য পড়তে বললেন। তাঁরই কথায় আমি গোর্কি, গোগোল, পুশকিন, চেকভ, অস্কার ওয়াইল্ডের লেখা পড়তে শুরু করলাম। এঁরা সব দুনিয়ার বড় বড়

লেখক। মির্জাসাব, এঁদের লেখা পড়তে পড়তেই আমি যেন আমার সামনের পথটাকে দেখতে পেলাম—আমিও লিখব, লেখাই আমার একমাত্র কাজ হতে পারে। এরপর বারিসাব কী করলেন জানেন? আমাকে দিয়ে উগোর "দ্য লাস্ট ডে'জ অফ দ্য কনডেমড" উর্দুতে অনুবাদ করালেন। দু'সপ্তাহ টানা লেগে থাকলাম, এক ফোঁটা মদ ছুঁইনি। তারপর লাহোরের উর্দু বুকস্টল থেকে আমার অনুবাদের বইও বেরিয়ে গেল—আসির কিয়ে শরগুজস্ত্। আমায় আর দেখে কে? শালা, ফালতু নাকি? এই দ্যাখ, দ্যাখ শালারা, সাদাত হাসান মান্টোর নামে ছাপা বই।

'মাসাওয়াৎ'-এ আমি নিয়মিত সিনেমার রিভিউ লিখতে শুরু করলাম। বারিসাবের মতে, ওই রিভিউ লেখার মধ্যে দিয়েই নাকি গল্পলেখক মান্টোর জন্ম। মির্জাসাব, আমি তখন একসঙ্গে অনেক কাজ করতে চাইছিলাম। হাসান আব্বাসের সঙ্গে মিলে অস্কার ওয়াইল্ডের নাটক 'ভেরা' অনুবাদ করে ফেললাম। এক বোতল মদ নিয়ে গেলাম আখতার শেরানির কাছে। সারা রাত ধরে শেরানিসাব মদ খেলেন আর আমার পাণ্ডুলিপি সংশোধন করলেন। সেই সময় অনেক রাশিয়ান গল্পও অনুবাদ করেছিলাম 'হুমায়ুন' আর 'আলমগীর' পত্রিকায়।

একদিন হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেল 'মাসাওয়াৎ'। বারিসাব লাহোরের একটা কাগজে কাজ নিয়ে চলে গেলেন। এর মধ্যে আরও কত কিছুই না ঘটেছিল। আমি, আবু সয়ীদ কোরেশি, আব্বাস, আশিক বারিসাবকে নিয়ে অমৃতসরের অলিগলিতে ঘুরে বেড়াতাম। আমাদের দলটার নাম দিয়েছিলাম 'ফ্রি থিংকার গ্রুপ'। আমরা যা খুশি তা-ই করতে পারি, ভাবতেও পারি। বিপ্লব করার কথাও ভেবেছিলাম। আমি আর আব্বাস ম্যাপ দেখে সড়ক পথে রাশিয়াতে যাওয়ার প্ল্যানও করেছিলাম। কিন্তু বারিসাব লাহোর চলে যাওয়ার পর, আমি তো আবার বেকার। লেখাতেও আর মন বসাতে পারি না। এক এক সময় মনে হয়, দূর শালা, জুয়ার ঠেকেই চলে যাই, সময়টা তো কেটে যাবে। কিন্তু জুয়া খেলার আগ্রহ আর তখন আমার ছিল না মির্জাসাব।

খবর এল, বারিসাব 'খুল্‌ক্' নামে নতুন সাপ্তাহিক পত্রিকা শুরু করেছেন। আমি আর হাসান আব্বাস গিয়ে তাঁর সঙ্গে কাজে জুতে গেলাম। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই বেরোল বারিসাবের প্রবন্ধ 'ফ্রম হেগেল টু মার্ক্স।'... কী হল? আপনারা সবাই এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন? চোখ দেখে মনে হচ্ছে, ঘুম পেয়েছে আপনাদের সকলের? মির্জাসাব, আপনারও? মাফ কিজিয়ে ভাইজানেরা, আমার বলার কথা কিস্‌সা, আর আমি কখন যে ইতিহাসের খপ্পরে পড়ে গেছি, বুঝতেও পারিনি। এখন আমারই হাসি পাচ্ছে। শালা, এ যেন আত্মজীবনী লিখতে বসেছি আমি। এই জন্য মাঝে মাঝে নিজেকে গালাগালি দিতে হয়, শালা শুয়ার কাঁহি কা, কবরে এসেছ তুমি আত্মজীবনী মারাতে! কিন্তু একটা কথা বলে নিতে দিন। 'খুল্‌ক্'-এর ওই সংখ্যাতেই কিন্তু আমার প্রথম গল্প 'তামাশা' বেরিয়েছিল। গল্পটা নেহাতই কাঁচা ভেবে নিজের নাম দিইনি। সেই গল্পের বিষয় ছিল একটা সাত বছরের ছেলের চোখে দেখা ১৯১৯-এর মার্শাল আইনের দিনগুলো। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ১৯১৯-এ আমার বয়সও ছিল সাত। আমার আফসানার ভেতরে এভাবেই আমি বারবার মিলেমিশে গেছি।

আচ্ছা, আমাদের মদের আড্ডার কিছু কিস্‌সা না হয় বলা যাক। দেখুন, দেখুন মির্জাসাব, সবার চোখ কেমন চক চক করে উঠেছে। লাভ কী ভাই? এই কবরে দারু কোথায় মিলবে? গোরু যেমন জাবর কাটে, নেশা-ভাঙের দিনগুলো নিয়েই জাবর কাটুন, তাতে একটু নেশাও হতে পারে। বারিসাব বলতেন, আব্বাস আর আমার মতো মাতাল নাকি হয় না। সত্যি বলতে কী, খারাপ কথার জন্য মাফ করবেন, যাকে বলে পোঁদ উল্টে খাওয়া, আমি আর আব্বাস সেভাবেই মদ খেতাম। মদের ছিপি সবসময় খুলত আবু সয়ীদ কোরাশি। তারপর আর দেখে কে? আর বারিসাব? এমনিতেই তো সব সময় কথা বলেন, এক গ্লাস পেটে পড়লেই যেন ফোয়ারা ছুটত কথার। আমি আর আব্বাস তো হারামি, মনে মনে বলতাম, বলুন, যত খুশি কথা বলুন হজুর, কিন্তু আমরা তো মাল মেরে ফাঁক করে দিই। বারিসাবের তো বক্তৃতা দিতে পারলেই নেশা হত। কিন্তু সভাসমিতিতে বক্তৃতা করার সাহস তাঁর ছিল না। সব আমাদের সামনে, মাল টানতে টানতে।

তবে মজার মানুষ তো, বারিসাব না থাকলে ঠেক যেন জমত না। একদিন সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। আমি জানলার পাশে বসে আছি। বারিসাব হেসে বললেন, 'কী মিঞা, হাল কেমন?'

—পানি কোথায়, যে হাল কেমন বুঝব?

তিনি দু'চোখে দুষ্টু হাসি ছড়িয়ে বললেন, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও এখুনি আসছি।' কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলেন। কাপড়ে জড়ানো মদের বোতল। আমি কিছু বলার আগেই ছিপি খোলা হয়ে গেছে। ততক্ষণে আব্বাসও হাজির। সব জানলা-দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। আব্বাস বাইরের কুয়ো থেকে লোটায় জল নিয়ে এল। তারপর আসর জমজমাট। একসময় বারিসাবকে খেপানোর জন্য আব্বাস বলল, 'এ-বাড়িতে সবাই আপনাকে সম্মান করেন। আপনি নামাজি মানুষ বলে বিবিজানও আপনাকে শ্রদ্ধা করেন। তিনি হঠাৎ এসে পড়লে কী হবে?'

বারিসাব চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি তা হলে জানলা দিয়ে পালিয়ে যাব, আর কোনও দিন তাঁকে মুখ দেখাব না।'

বারিসাবের যে ভীরুতার কথা বলেছিলাম, তা এইরকম। আর এই ভীরুতার জন্যই বারিসাবের মতো মানুষ যা করতে পারতেন, তার কিছুই তিনি করেননি। ব্রিটিশ হাই কমিশনারের অফিসে চাকরি নেবার পর তো আমাদের থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন। মাঝে মধ্যে রাস্তায় দেখা হয়ে যেত। তিনি যেন আমাদের চিনতেই পারতেন না। তাঁর মৃত্যুর দু'দিন আগে জোহরা চকে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সমঝোতা করতে করতে একটা মানুষ কতটা ভেঙে পড়তে পারে, তাঁকে দেখে বুঝেছিলাম। আমার সত্যিই দুঃখ হয়েছিল। এই সে-ই বারিসাব, যাঁর হাত ধরে মান্টোর নতুন জন্ম হয়েছিল?

ভাইজানেরা একটু ধৈর্য ধরে শুনুন। বারিসাব সম্পর্কে 'গাঞ্জে ফেরেশ্‌তে'-তে আমি স্পষ্টই লিখেছিলাম, সমাজসংস্কারক হওয়ার খুবই সাধ ছিল বারিসাবের। ইচ্ছে ছিল, গোটা দেশ এক ডাকে তাঁকে চিনবে। তিনি হবেন জাতির বরেণ্য পথিকৃৎ। সব সময় ভাবতেন, এমন কিছু করবেন, যাতে আগামী প্রজন্ম তাঁকে মনে রাখবে। কিন্তু সেজন্য যে তাকৎ-এর প্রয়োজন হয় তা ছিল না বারিসাবের। তিনি শুধু দু'চার পেগ খেয়ে হিরামান্ডির মেয়েদের সঙ্গে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে যেতেন। তারপর ফিরে এসে অজু করে নামাজ পড়তেন। আমার সত্যিই দুঃখ হয় মির্জাসাব, মানুষ নিজের পিঠের চামড়া বাঁচাতে এতটাই নীচে নামতে পারে? কবরের কোথাও তো বারিসাবও শুয়ে আছেন, হয়তো আমার কথা শুনছেনও, কিন্তু এখানে তো পালিয়ে যাওয়ার জন্য জানলা নেই। পালিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও জানলা খোলা থাকে না, তাই না, মির্জাসাব? এই জীবনের দাম সুদে-আসলে মিটিয়ে যেতে হবে এখানেই। মাফ করবেন ভাইজানেরা, আবার কয়েকটা বড় বড় কথা বলে ফেললাম। কথা কী জানেন, বারিসাবকে যে আমি মনে-প্রাণে ঘৃণাও করতে পারলাম না, শুধু অনুকম্পা ছাড়া আর কিছু নেই। আমার কী মনে হয় জানেন, যে অনুকম্পা পায়, তার চেয়েও খারাপ মানুষ, যে অনুকম্পা করে।

না, আর এই সব নৌটঙ্কিবাজি নয়, তার চেয়ে হিরামান্ডি নিয়ে কথা বলা ভাল। দেশভাগের আগে লাহোরকে কী বলা হত জানেন তো? প্রাচ্যের প্যারিস। আর হিরামান্ডি হচ্ছে তার জান। অনেকে

বলত টিব্বি।

টিব্বি মেঁ চল কে জলবা-ই-পরওয়ার দিগর দেখ
আরে য়ে দেখনে কি চিজ হ্যয় ইসে বার বার দেখ

দেওয়ালে ঘেরা পুরনো লাহোরের রোশনির আর এক নাম হিরামান্ডি। এখানেই তো আমি সুলতানা, সৌগন্ধী, কান্তাদের খুঁজে পেয়েছিলাম ভাইজানেরা। হিরামান্ডি মানে যদি ভাবেন, শুধু কতগুলো মেয়ের মাংসের স্তূপ তা হলে ভুল করবেন। একসময় হিরামান্ডির তবায়েফদের কাছে আদাব আর তহজিব শিখতে আসত নবাব-বাদশা রাজা-মহারাজাদের ছেলেরা। তবায়েফরাই তো শেখাতে জানত আদব-কায়দা। নাচে-গানে-কটাক্ষে গুফ্‌তগু-তে। মির্জা রুশবার 'উমরাও জান' যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের কাছে নতুন করে আর কিছু বলবার নেই। আর আমাদের মির্জাসাব তো সবই জানেন। কত মশহুর তবায়েফের সঙ্গে মোলাকাত হয়েছে মির্জাসাবের। তবায়েতদের কোঠা তো শুধু মস্তি লোটার জায়গা নয়, সেই মেহফিলে যেতে হলে তার তরিকাও শিখতে হবে। যার-তার পয়সায় কেউ হাত দিতে পারত নাকি? আশনাই-এর ব্যাপার ছিল দিল্-এ রং ধরাতে পারলে, তবেই না তার সঙ্গে বিছানায় যাওয়ার কথা ওঠে। না হলে ঠুংরি, দাদরা, গজল শোনো, কথক দেখে তারপর টাকা ফেলে ঘরে ফিরে যাও।

হ্যাঁ, আপনি হিরামান্ডির কোনও কোঠার সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। সেখানে দালাল আছে, ফুলওয়ালা আছে। দালালের সঙ্গে কথা বলে তবেই না আপনি কোঠায় পৌঁছতে পারবেন। কিন্তু কোঠায় যাওয়ার আগে ফুলওয়ালার কাছ থেকে মালা কিনে কবজিতে জড়িয়ে নিতে হবে। তারপর সিঁড়ি বেয়ে আপনি রংমহলে এসে পৌঁছলেন। ঝাড়বাতির আলো, দেওয়ালে দেওয়ালে আয়না, খানদানি সব ছবি, ফুল আর আতরের সুবাসে আপনার মন এক নিমেষেই যেন একটা বাগান হয়ে গেল, আর গাছে গাছে ডেকে উঠল কোকিলেরা। মেঝেতে কার্পেটের ওপর পাতলা সাদা চাদর পাতা আছে, তাকিয়াও মজুত, আপনি ঠেস দিয়ে বসুন। বাইজি এসে বসবেন একেবারে মাঝখানে। তাঁর পিছনে সারেঙ্গি, বীণা, তবলার শিল্পীরা। ওই যে, বয়স্ক মহিলাটিকে একটু দূরে বসে আছে দেখছেন, তিনি এই কোঠির মালকিন। একসময় নিজেও তবায়েফ ছিলেন, এখন সব দেখভাল করেন। নতুন নতুন তবায়েফদের রেওয়াজ করিয়ে খুবসুরত করে তোলেন। মালকিনের পাশেই রাখা আছে সোনালি ও রুপোলি তবক-দেওয়া পানের খিলি-ভরা রুপোর খাসদান। শ্বেতপাথরের জলচৌকির ওপর সোনার কাজ করা গোলাপপাশ। একটা পাত্রে দেখবেন জাফরান-মেশানো কুচো সুপুরি, মশলা, জর্দা। মালকিন প্রথমে সবার সঙ্গে বাতচিত করবেন, বুঝে নেবেন কোন মেহমানের তরিকা কেমন। এরপর এক তরুণী সারা ঘর ঘুরে ঘুরে সবার হাতে পানের খিলি তুলে দেবে। তখন কী করতে হবে আপনাকে? অন্তত একটা রুপোর মুদ্রা তার হাতে দিতেই হবে। এবার বাইজি এলেন সিল্কের সালোয়ার-কুর্তা পরে, কুর্তার বুকে সোনা বা রুপোর জরির কাজ করা বাহারি নকশা। মুখ ঢাকা আছে হালকা ওড়নায়, যেন একখণ্ড কুয়াশা ছড়িয়ে রেখেছেন মুখের ওপর। গয়নাগুলো ঝলসাচ্ছে আলোয়।

বাইজি এবার গান ধরবেন। প্রত্যেক মেহমানের জন্য আলাদা আলাদা গান, গাইতে গাইতে আপনার দিকে তাকিয়ে চোখ ঠারবেন, মৃদু হাসবেন। গান শেষ হলে আপনি তাকে কাছে ডাকুন, টাকার তোড়া তুলে দিন তার হাতে। এবার অন্য মেহমানের দিকে তিনি নজর ফেরাবেন। গানের সঙ্গে নাচও দেখার ইচ্ছে হতে পারে আপনার। তখন ঘুঙুরের মুখে বোল ফুটবে। গান-বাজনা-নাচের ছন্দের সঙ্গে মিলেমিশে আওয়াজ উঠছে, 'ওয়া ওয়া', 'বহুৎ খুব', 'মারহাব্বা', 'মারহাব্বা'। ব্রিটিশরা আসার পর হিরামান্ডির পুরনো জৌলুস চলে গেলেও সূর্যাস্তের আভাটুকু লেগেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে হিরামান্ডি যেন মাংসের কারাগার হয়ে উঠল। কারা আসত তখন? নতুন গজিয়ে-ওঠা ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, যুদ্ধের বাজারে ফোকটে পয়সা করা লোচ্চারা, যারা তরিকা শব্দটার মানেই জানে না। এই দুই হিরামান্ডিই আমি দেখেছি ভাইজানেরা। কোঠার বাইজিদের কল-গার্ল হয়ে যেতে দেখেছি, যারা টাকা হাতে পেলেই যে-কোনও হোটেলের বিছানায় আপনার সঙ্গে গিয়ে শুয়ে পড়বে। কিন্তু আমার কাছে তো হিরামান্ডি মানে সোনার জলে মিনে-করা একটা ছবি।

মাংস নয়, মহব্বত-এর জন্যই এখানে আমি মানুষকে ফতুর হয়ে যেতে দেখেছি। তার নাম আমি বলব না; সে ছিল পাঞ্জাবের এক জমিদার। হিরামান্ডির জোহরাজানের প্রেমে পড়েছিল সে। প্রায়ই সে হিরামান্ডিতে এসে জোহরাজানের সঙ্গে থাকত। লোকে বলত, জোহরাজানের যৌবন নাকি তার হাতেই তৈরি। মানেটা বুঝতে পারছেন তো ভাইজানেরা? হঠাৎ একদিন জমিদারের শখ হল, সে গাড়ি কিনবে, আর গাড়িতে চড়িয়ে জোহরাকে নিয়ে লাহোরের পথে পথে ঘুরে বেড়াবে। জমিদার হলে কী হবে, টাকাপয়সা বেশি জমাতে পারেনি; জোহরার পরিবারের পিছনেও দেদার টাকা খরচ করেছিল সে। কিন্তু গাড়ি যে কিনতেই হবে। শেষে একটা গাড়ির কোম্পানির কাছ থেকে ধারে গাড়ি কিনে ফেলল সে। খেতির ফসল বিক্রি করে ছ'মাস অন্তর টাকা দিয়ে ধার শোধের কড়ার করেছিল, তাতে তিন বছরেই সব টাকা শোধ হয়ে যাওয়ার কথা। গাড়ির কোম্পানি দু'বার সময় মতো টাকা পেল। কিন্তু তারপর থেকে আর জমিদারের পাত্তা নেই। সে যে কোথায় গেছে, কেউ জানে না। শুধু জানা গেল, জমিজিরেত বেচে জোহরাজানকে নিয়ে সে কলকাতায় চলে গেছে। গাড়িটা দেশের বাড়িতেই রাখা ছিল, তাই কোম্পানি গাড়িটা অন্তত ফেরত পেল।

এরপর বছর দশেক কেটে গেছে। সেই গাড়ির কোম্পানির ম্যানেজার তাঁর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে হিরামান্ডিতে এসেছেন রঙিন সন্ধ্যা কাটাবেন বলে। একটা কোঠার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি সেই পালিয়ে যাওয়া জমিদারকে দেখতে পেলেন; তার চেহারা তখন একেবারে ভেঙে গেছে, চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি।

—জোহরাজানের গান শুনবেন হুজুর? জমিদার এগিয়ে এসে ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করল।

—আপনার এ কী অবস্থা হয়েছে? কোথায় ছিলেন এতদিন?

—সব নসিবের লিখন হুজুর। জোহরাকে নিয়ে আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম। কত চেষ্টা করলাম, যাতে ওকে ফিলিমে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়।

—তারপর?

—কিছু হল না। আমার যেটুকু টাকাপয়সা ছিল, তাও উড়ে গেল। ফিলিমে ওরা কিছুতেই জোহরাকে জায়গা দিল না।

—তাই আবার ফিরে এলেন?

—কী করব বলুন? জোহরার জীবনটা তো চালাতে হবে। আমিই বা ওকে ছেড়ে যাব কী করে? তাই এখন ওর জন্য খদ্দের ধরে আনার কাজটা আমাকেই করতে হয় হুজুর।

হিরামান্ডিতে যেমন অনেক রোশনাই, তেমনি এভাবে অন্ধকারও আসে মানুষের জীবনে। ভাইজানেরা, এই অন্ধকারের ভিতরেও আমি একটা জোনাকি জ্বলতে দেখেছি। মহব্বতের জোনাকি। ফতুর হয়ে গিয়েও লোকটা জোহরাজানকে ছেড়ে যায়নি। আশিক্ থেকে দালাল হয়ে গেছে। কিন্তু তার প্রেম মরেনি।

বারিসাবের মতো মানুষেরা হিরামান্ডিতে ওসব দেখতে পাননি। আর আমি হিরামান্ডি যেতাম মাংসের ভেতরে লুকনো রত্ন খুঁজতে, এইরকম জোনাকির আলো দেখতে। আল্লার কসম, মান্টো কখনও ওদের সঙ্গে শোওয়ার কথা ভাবেনি। সত্যিই কি? নাকি এটাও মিথ্যে বললাম?

চলবে

ঝিলডাঙার কন্যা

প্রচেত গুপ্ত

বয়ঃসন্ধি নিয়ে লেখা লিখছিলেন সুদর্শন রায়। এখন আর একটানা লিখতে ভাল লাগে না। অথচ এই-মানুষই বিয়ের পরে রাতের পর রাত জেগে কাজ করতেন। তা নিয়ে স্ত্রী সুনন্দার সঙ্গে রাগারাগিও হত। সেসব এখন অতীত। সুনন্দা চলে যাওয়ার পর কথাকলি দিনে চারবার করে ফোন করে বাবার খোঁজখবর নেয়। এসব ভাবতে ভাবতেই একটা ফোন আসে। ঝিলডাঙার নিতাইয়ের ফোন। সুদর্শন রায় ঠিক করেন ঝিলডাঙা যাবেন।

আটচল্লিশ

ক্যামেরা, আলো সব রেডি। কিন্তু শুটিং শুরু করা যাচ্ছে না।

ঝামেলা হচ্ছে। মোম চ্যাটার্জি ঝামেলা শুরু করেছে। ঝামেলা মোম চ্যাটার্জি একা করছে না, মোবাইল ফোনে মেয়েকে ঝামেলার পয়েন্ট জোগাচ্ছে তার মা, মিসেস আলো চ্যাটার্জি। ঠিক ছিল, শুটিং-এর সময় তিনি নিজেও থাকবেন। কিন্তু বাতের ব্যথা বেড়ে যাওয়ার কারণে আসতে পারেননি। আগে একবেলা ঠান্ডা জল-গরম জল ট্রিটমেন্ট নিতেন, এখন তিনবেলা নিচ্ছেন। কাজ হচ্ছে না। এতে ইউনিটের সবাই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। ভেবেছিল, যাক ফাঁড়া কাটল। বাত দেবতা মুখ তুলে তাকিয়েছেন।

ফাঁড়া যে কাটেনি এখন বোঝা যাচ্ছে। মহিলা মেয়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রাখছেন।

শুদ্ধনাথ মনে মনে নিজের গালে চড় মারল। নিজের ওপর রাগ হলে মানুষ সাধারণত নিজের একগালে চড় মারে। শুদ্ধনাথ দু'গালেই মারল। একবার ডান গালে, একবার বাঁ গালে। কেন সে এই ভুল করল? কী করে করল? দিনে দিনে এই মেয়ে গোলমাল পাকানোয় যে কত বড় ওস্তাদ হয়ে উঠছে সে কথা তার ভাল করেই জানা আছে। একদিকে নাম বাড়ছে অন্যদিকে বদামি বাড়ছে। তবু কেন তাকে এই কাজটায় নিল? ইন্ডাস্ট্রিতে ভদ্রভাবে কাজ করার মতো যোগ্য মেয়ের অভাব নেই। বরং রোজই নতুন করে কেউ না কেউ আসছে। তাদের কাজও সুন্দর, স্বভাবচরিত্রও সুন্দর। তা হলে কেন মোমকেই নিতে হবে? খুব বড় ভুল হয়ে গিয়েছে। এই ভুল কতদূর গড়াবে কে জানে।

বিজ্ঞাপনের কাজ হাবিজাবি সিরিয়াল তৈরির মতো সহজ কাজ নয়। স্ক্রিপ্ট বগলে নিয়ে যা খুশি একটা করে দিলেই হয় না। শুধু শাশুড়ি, বউমার মুখের সামনে নট নড়নচড়ন কায়দায় ক্যামেরা ধরে রাখলাম আর হয়ে গেল তা নয়। বিজ্ঞাপন তৈরির সময় ফাঁকিবাজি চলে না। এক দেড় মিনিটের মধ্যে স্কিল অনেক বেশি দেখাতে হয়। নইলে জিনিস খারাপ হবে, পরের অর্ডারটা পাওয়া যাবে না। টিভি হোক আর সিনেমা হোক কম বেশি আজকাল সব ডিরেক্টরই মূল কাজের পাশাপাশি বিজ্ঞাপনের কাজ খোঁজে। নইলে সারা বছর পেট চালানো মুশকিল। তাই এ কাজের সময় কোনও ধরনের গোলমাল থাকাই ঠিক নয়। সব চলবে হিসেব মতো। এখন মনে হচ্ছে, মোম চ্যাটার্জিকে নিয়ে 'গোলমাল' সে-ই ডেকে আনল। খাল কেটে কুমির আনার মতো।

যদিও কথাটা ঠিক নয়। এখানে মোমকে নেওয়ার পিছনে শুদ্ধনাথের একার হাত ছিল না। বরং উল্টোটাই। সে চেয়েছিল অন্য কেউ আসুক। এই কারণে অর্ডারটা পাওয়ার পর সে তার দক্ষিণ ভারতীয় পার্টিকে অনেক নায়িকারই ফটো পাঠিয়েছিল। প্রায় দু'মাস ঝাড়াই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়া চলে। পার্টিকে ফটো মেল করা হয় দু' পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে আটটা, পরের পর্যায়ে আরও চারটে। মোট এক ডজন মেয়ের মধ্যে পার্টি মোমের ফটোতে 'টিক' মেরে পাঠিয়েছে। শুধু 'টিক' নয়, কোনও অলটারনেটিভও রাখেনি। এই অবস্থায় শুদ্ধনাথের কী করার ছিল? কিছুই নয়। তার তো হাত পা

বাঁধা হয়ে গেল। পার্টি যাকে চেয়েছে তাকেই নিতে হবে। পয়সা যার পছন্দ তার। ঝামেলা শুধু পরিচালকের।

ঝামেলার খবর পাওয়ার পর থেকে শুদ্ধনাথের সন্দেহ হচ্ছে, মোম কোনও সূত্র থেকে পার্টির পছন্দের কথা জানতে পেরেছে। এক-দু'জন নয়, একেবারে বারোজনের মধ্যে থেকে সিলেক্ট হওয়ার খবর জানতে পারলে যে কোনও এলেবেলে আর্টিস্টেরই মাথা ঘুরে যাওয়ার কথা। মোমেরও মাথা ঘুরেছে। আর কোনও খবর পায়নি তো? শুদ্ধনাথ যে তাকে বাদ দেওয়ার চেষ্টায় ছিল সেই খবর? পেলে কেলেঙ্কারি।

ঝামেলার বিষয় জানার পর শুদ্ধনাথ জানতে পারল কেলেঙ্কারিই হয়েছে।

বিজ্ঞাপনের বিষয় বিস্কুট। শুটিং-এর সময় সমস্যা যদি কিছু হয় তা হলে সেটা হওয়ার কথা বিস্কুট নিয়ে। কিন্তু সমস্যা তা নিয়ে হচ্ছে না, হচ্ছে প্যান্ট নিয়ে। মোম চ্যাটার্জির প্যান্ট। কাজ শুরুর ঠিক মুখে মোম আপত্তি তুলেছে। খাটো ঝুলের শর্টস সে পরবে না। এই জিনিস নাকি পরাও যা, না পরাও তাই। এমন কোনও চুক্তি তার সঙ্গে হয়নি যে কিছু না পরে ক্যামেরার সামনে তাকে দাঁড়াতে হবে। সুতরাং এই কাজ সে করবে না।

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়, একেবারে সত্যিও নয়। শর্টসের মাপ তাকে ইঞ্চি সেন্টিমিটার মেপে বলা না হলেও শুদ্ধনাথ তাকে কিছুটা জানিয়েছিল। কথা হয়েছিল এরকম—

'কাজ হবে দু'টো ভাগে। শহরে আর গ্রামের পটভূমিকায়।'

মোম বলল, 'আলাদা আলাদা বিস্কুট?'

'না, একই বিস্কুট। শহরের মেয়েও খাচ্ছে, গ্রামের মেয়েও খাচ্ছে।'

'সে আবার কী শুদ্ধদা? শহর আর গ্রামের মানুষ একই জিনিস খায় বলে তো শুনিনি কখনও!'

'আহা, তোমার আমার শোনাশুনিতে কী আসে যায় মোম? ক্লায়েন্ট যা চাইছে তাই তো করতে হবে। ক্লায়েন্ট বলেছে, এই প্রোডাক্টের মূল জোরটা থাকবে এনার্জির ওপর। এনার্জি রিগেইন। পরিশ্রম করার পর এই গ্লুকোজ ঠাসা বিস্কুটে কামড় দিলেই ক্লান্তি দূর হয়। শহরেও দূর হয়, গ্রামেও দূর হয়। এরপরই আমি কনসেপ্টটা তৈরি করি।'

'বিস্কুটের নাম কী?'

'বাংলায় নাম হচ্ছে শক্তি। সাউথ ইন্ডিয়ায় অন্য নামে চলে। ওখানে অবশ্য প্রোমোশন হয়েছিল, মেল আর্টিস্ট দিয়ে। সে কাজও আমি দেখেছি। রেসলার নিয়ে কাজ। বক্সার লড়তে লড়তে হেরে যাচ্ছে। রিঙের পাশে গিয়ে শক্তি বিস্কুটে দু'টো কামড় মারল, ব্যস সঙ্গে সঙ্গে শরীরে হাতির বল এল। প্রতিদ্বন্দ্বীকে এক ঘুসিতে কুপোকাত।'

মোম হেসে বলেছিল, 'বাপরে বিস্কুট খেয়ে বক্সিং! বিজ্ঞাপনের কী ছিরি!'

শুদ্ধনাথ বলেছিল, 'অসুবিধের কী? সফ্‌ট ড্রিংক্স খেয়ে ফিল্মস্টার যদি ছাদ থেকে ছাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, বিস্কুট খেয়ে বক্সিং হবে না কেন? আমি এই শক্তির সঙ্গে নারীশক্তির ব্যাপারটা আনতে চেয়েছি। সেই অনুযায়ী পার্টিকে কনসেপ্ট পাঠাই। বলি, বাংলায় মেয়েদের ব্যাপারটা বেশি অ্যাকসেপটেড হবে। ওরা রাজি হয়ে যায়।'

মোম ঠোঁট উল্টে বলে, 'নারীশক্তি না কচু শুদ্ধদা, তোমার ওই পার্টি সেক্সের কারণে রাজি হয়ে গিয়েছে। মেয়ে হলে শরীর দেখানো যাবে। অবশ্য সেটাও একরকম নারী শক্তি তো বটে। তাই না?'

কথা শেষ করে মোম হাসতে থাকে। শুদ্ধনাথ খানিকটা অস্বস্তিতে পরে। কথাটা মিথ্যে নয়। তবে মোমকে পুরোটা বলা যাবে না। বললেই টাকা পয়সা বেশি হাঁকবে। কস্টিউমের কথা যা ভাবা হয়েছে, তাতে মোমের শরীরের অনেকটাই এক্সপোজড থাকবে। শুদ্ধনাথ সাবধানে এই প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলল, 'শহরে তুমি একজন আধুনিকা। মর্ডান মেয়ে। সকালে পার্কে জগিং করতে করতে হাঁপিয়ে পড়লে। গাছের তলায় দাঁড়ালে। প্যাকেট ছিঁড়ে শক্তি বিস্কুটে ছোট্ট একটা কামড় দিলে, ব্যস আবার চার্জড। ফের জগিং শুরু করলে।'

মোম ভুরু কুঁচকে বলল, 'আর গ্রামে? গ্রামেও জগিং করব? নাকি বক্সিং?'

'দূর, গ্রামের মেয়েরা আবার ওসব করে নাকি? সেখানে ভাবা হয়েছে, ধানখেতে কাজ হবে।'

'ধানখেতে!'

'হ্যাঁ, সেখানে তুমি গ্রাম্য বধূ। হেঁসো দিয়ে ধান কাটবে। কাটতে কাটতে ক্লান্ত হবে, ঘাম মুছবে। শাড়ির কোচর থেকে শক্তি বিস্কুট বের করে খাবে। আবার হাসি মুখে ধান কাটা শুরু হবে। পিছনে একটা ফোক টিউন রাখছি। হেই সামালহো, হেই সামালহো, হেই সামালহো ধান হোক...কেমন হবে?'

শুদ্ধনাথ তৃপ্তিতে হাসল। মোম অবাক গলায় বলে, 'হেঁসোটা কী?'

'দা'য়ের মতো, ধান কাটতে লাগে। গ্রাম সম্পর্কে কিছুই জানো না দেখছি মোম। এটা ঠিক নয়। দিস ইজ নট কারেক্ট। অভিনয় করতে গেলে শহর, গ্রাম নগর বন্দর সব জানতে হবে। যদি ধান খেত না চাও তা হলে ঢেঁকিতেও দাঁড়াতে পারো। ধরো ঢেঁকিতে ধান ভাঙতে ভাঙতে টায়ার্ড হয়ে গেলে। শক্তিতে কামড় দিয়ে সেই ক্লান্তি কাটল।'

'মনে হচ্ছে, সেটা বেশি ইন্টারেস্টিং হবে।'

'সে দেখা যাবে। আগে তো আরবান অংশটা শুট করে নিই। নাও ডেট বলো মোম।'

মোম নিজের দু'হাতের নখের দিকে আদুরে গলায় বলে, 'তোমার কাছে আর ডেট কী শুদ্ধদা। যেদিন বলবে, সেদিনই মেকআপ নিয়ে ক্যামেরার সামনে হাজির হব। পেমেন্ট কিন্তু সবটাই আগে করতে হবে। বাইরের প্রোডিউসার। ধার বাকি রাখা যাবে না কেটে গেলে আর ধরতেই পারব না। তুমি বরং একটা কাজ করো, কতদিনের কাজ হিসেব করে আরবান, রুরাল মিলিয়ে একটা প্যাকেজ করো। করে পেমেন্টটা দিয়ে দাও। মা নইলে আবার রাগারাগি করবে। আমার মাকে তো চেনো শুদ্ধদা। রাগ করলে কমতেই চায় না।'

শুদ্ধনাথ বিরক্ত গলায় বলল, 'টাকা টাকা করছ কেন? কোনওদিন তুমি আমার কাজে পেমেন্ট ঠিক মতো পাওনি? তাছাড়া অ্যাডের কাজে কত মাইলেজ সেটা তো দেখবে। পার্টি বড় করে নামতে চাইছে। ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট, আউটডোর হোর্ডিং পোস্টার সব হবে।'

মোম ফিক করে হেসে বলল, 'সেই জন্যই অন্য সবার ডেট ফেলে রাজি হচ্ছি। আচ্ছা, ওই জগিং-এর কস্টিউমটা কী?'

শুদ্ধনাথ ঢোঁক গিলল। খানিকটা দায়সারা ভাবে বলে, 'কী আর হবে, জগিং করতে যে পোশাক লাগে সেটাই হবে। জগিং তো আর শাড়ি বা শালোয়ার পরে করবে না। এই ধরো একটা শর্টস আর টি-শার্ট পরলে। আমি সাদাই চাইব। একেবারে মিল্ক হোয়াইট। ভোরের নরম ভাবটা থাকবে। মাথায় একটা ডার্ক ব্লু ব্যান্ড দিতে পারো। ধরো রিস্টেও একটা ব্যান্ড লাগালে। সেখানে আই-পড প্লাগ করা থাকবে। আজকাল তো সবাই গান-বাজনা শুনতে শুনতে জগিং এক্সারসাইজ করে। মনে হয় সেটাই ঠিক হবে।'

সবই ঠিক ছিল। বালিগঞ্জ ক্লাবের একটা দিক ভাড়া করে আলো, ক্যামেরা, ক্রেন রাখা হয়েছে। এমনি ক্রেন নয়, জিমিজিপ ক্রেন। এই ক্রেনের মাথায় ক্যামেরা বনবন করে চারপাশে ঘুরতে পারে। শট ভাবা আছে শুদ্ধনাথের। গাছের তলার লাল মোরামের

রাস্তা ধরে মোম ছুটে আসবে। জিমিজিপ নামবে ডালপাতার ফাঁকফোঁকর দিয়ে। ডামি দিয়ে আলোও মাপা-টাপা হয়ে গিয়েছে। নেচারাল আলো দিয়ে কাজ হচ্ছে না। সবটাই অ্যারেঞ্জ করতে হয়েছে। যেটুকু রোদ থাকছে থাকুক, বাকিটুকু কেটে নিতে হবে।

এবার আর্টিস্টকে ডাকা হবে, ঠিক এরকম সময় ঝামেলা এসে হাজির।

মোমের অ্যাসিসটেন্ট কাম পরিচারিকা কাম ম্যানেজার বুলু নামের অতি পাকা মেয়েটি গম্ভীর মুখে শুদ্ধনাথের পাশে এসে দাঁড়াল। গলা নামিয়ে বলল, 'দিদি আপনেরে ডাকে।'

শুদ্ধনাথ চমকে উঠে বলল, 'আমারে ডাকে মানে! সব রেডি, আমরাই তাকে তো ডাকছি। শট শুরু হবে।'

'সে জানি না আপনে চলেন। দিদি তার মায়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে।'

প্রমাদ গুনল শুদ্ধনাথ। মোম তার মায়ের সঙ্গে কথা বলে তাকে ডেকে পাঠানোর অর্থ নিশ্চয় কোনও গোলমাল। ওই মহিলা কখনও এমনি ঢোকে না। গোলমাল নিয়ে ঢোকে।

ক্লাবের একটা এসি ঘরে মোমের মেকআপ এবং পোশাক বদলানোর জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে ঢুকতেই শুদ্ধনাথ জানতে পারল, তার আশঙ্কাই সত্যি। কানে মোবাইল লাগিয়ে ওইটুকু ঘরেই উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করছে মোম। উত্তেজিত হলেও তাকে দেখাচ্ছে দারুণ। টি-শার্ট আর শর্টসে ঝলমল করছে। ঠিক যেমনটা শুদ্ধনাথ চেয়েছিল। ফরসা, ছিপছিপে দু'টো পায়ের প্রায় পুরোটাই উন্মুক্ত। উরুর খানিকটা ওপরেই প্যান্ট শেষ হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘ উজ্জ্বল নগ্নতার শেষে পায়ের পাতার স্নিকার। তার রং-ও সাদা। শুধু ফিতেটুকু নীল। টি-শার্টের ঝুলেও টানাটানি রাখা আছে। ইচ্ছে করেই রাখা আছে। দৌড়নোর সময় হালকাভাবে পেট, পিঠ দু'টোই যাতে বেরিয়ে পড়ে। হালকাই ভাল। শার্টের আড়ালে থাকা বুক দু'টো নিঃখুত এবং স্পষ্ট। দুশ্চিন্তার মধ্যেও শুদ্ধনাথ দ্রুত ভেবে নিল, ক্রেন দিয়ে ওপর থেকে নয়, আগে এই মেয়ের পা দু'টোকে ফ্রেমে রাখতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে ক্যামেরা উঠবে একবার এই বিজ্ঞাপন যে দেখবে, সে বারবার দেখার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। নারীশক্তি কাকে বলে দেখিয়ে ছাড়বে একেবারে

মোম মোবাইলে কথা চালাচ্ছে—

'কী যে বলো মা, কত ইঞ্চি আমি কি মেপেছি?...আমি কি টেপ ফিতে নিয়ে শুটিং-এ আসি?... বলছি তো কম, একেবারে এইটুকু। জাস্ট কোমোর থেকে...না না এরকম কোনও কথা হয়নি...শুধু ঝুলে কম না মা, ইটস মোর অর লেস স্কিন ফিটিং...আমি কী করে আগে দেখব...ইটস ইমপসিবল মা...তুমি বুঝতে পারছ না...শর্টস পরতে হবে এটা জানতাম কিন্তু তার যে হাল এই হবে আমি কী করে বুঝব?...পেমেন্ট অনুযায়ী...আসলে শুদ্ধদার সঙ্গে তো আমার কাজ অনেকদিনের, আমি বিশ্বাস করেই রাজি হয়েছিলাম...হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি, ওই তো শুদ্ধদা এসেছে...এখন রাখছি মা...ডোন্ট ওয়ারি...।'

মোবাইল কেটে মোম শুদ্ধনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা কী হল শুদ্ধদা?'

শুদ্ধনাথ মনে মনে সতর্ক হল। সাবধানে কথা বলতে হবে। ঝামেলা ঠান্ডা মাথায় মেটাতে হয়। এই মেয়ের শেষ মুহূর্তে ব্ল্যাকমেল করার স্বভাব ক্যামেরা অন করার আগে বেঁকে বসে। ফট করে নাম করার অসুখ। কারও কারও হয়। মোমের অসুখ একটু বেশি টেরাবেঁকা। তবে ঠিক মতো হ্যান্ডেল করতে পারলে সামলানোও যায়। 'ঝরনার মতো জীবন' সিরিয়ালে কাজ করার সময় সামান্য একটা চড় নিয়ে এই মেয়ে কম বিপদে ফেলেনি। বিদিশার হাতে নাকি চড় খাবে না। প্রফেশনাল জেলাসি। আরে বাবা, বিদিশা ক্যামেরার পিছনে বিদিশা, সামনে তো কাহিনির চরিত্র। মোম কিছুতেই শুনবে না। শেষ পর্যন্ত মেয়ে বদলে কাজ করতে হয়েছিল।

'কী হয়েছে মোম?' শুদ্ধনাথ এমনভাবে কথাটা বলল যেন কিছুই বুঝতে পারছে না।

মোম ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'কী হয়েছে মানে? বুঝতে পারছ না কী হয়েছে? হোয়াট ইজ দিস?'

কথাটা বলে নিজের দু'টো পায়ের দিকে তাকাল মোম। দু'পাশে হাত ছড়িয়ে বলল, 'এই কস্টিউমে আমাকে কাজ করতে হবে!'

'কেন! অসুবিধেটা কী?'

'অসুবিধে কী!'

'সকালে জগিং করতে তো এরকম কস্টিউমই সবাই পরে। একজন মডার্ন মেয়ে তুমি। পোশাকে সেই ব্যাপারটা তো ধরতে হবে। ইউ আর লুকিং বিউটিফুল। বিউটিফুল বললে কম বলা হয়। ভেরি বিউটিফুল অ্যান্ড গ্ল্যামারাস। অ্যাড একবার রান করতে শুরু করলে কী কাণ্ডটা হয় দেখবে।'

কথাটা বলে হাসির অভিনয় করল শুদ্ধনাথ।

মোম গলায় উত্তেজনা এনে বলল, 'আমার দেখার কোনও দরকার নেই। তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল, ইউ আর এক্সপেকটিং সামথিং মোর। এই প্যান্ট পরাও যা, কিছু না পরাও তাই। কোন আধুনিক মেয়ে সকালবেলা ন্যুড হয়ে পার্কে দৌড়াদৌড়ি করে জানতে পারি?'

শুদ্ধনাথ জিভ কেটে বলল, 'আহা, তোমার মুখে কিছু আটকায় না মোম। আমি কি সেকথা বললাম? বিজ্ঞাপনে কস্টিউম একটু চড়ার দিকে না রাখলে চলে না।'

বুলুর এগিয়ে দেওয়া তোয়ালে কোমরে জড়িয়ে নিল মোম।

'আমাকে আগে বলা উচিত ছিল।'

'আগে তো বলেইছিলাম। শর্টস আর টি-শার্টের কথা বলিনি?'

'তা বলে সেটার লেন্থ এরকম হবে! এইটুকু! এ তো জাস্ট লাইক আ প্যান্টি! ছি ছি। ইস আগে খেয়াল করিনি। পরবার পর বুলু নজর করল।'

শুদ্ধনাথ কড়া চোখে বুলুর দিকে তাকাল। এই ফিচকে মেয়েটাও তা হলে এর মধ্যে আছে। বুলুও পাল্টা চোখ পাকাল। যেন সে সিনেমার পরিচালক নয়, সিনেমার ভিলেন। তার মালকিনকে প্রকাশ্য দিবালোকে বেইজ্জত করতে যাচ্ছে। শুধু চোখ পাকানো নয়, বুলু মুখ পাকিয়ে বলল, 'দিদিকে তো বললাম, এমা! তোমায় যে নাঙ্গা দেখায়!'

শুদ্ধনাথ বুলুকে ধমক লাগায়, 'অ্যাই তুমি থামো দেখি।' তারপর মোমের দিকে ফিরে বলে, 'তুমি বুঝতে পারছ না ইউ আর লুকিং সো গর্জাস। এই কাজটা হয়ে গেলেই অ্যাড ওয়ার্ল্ডে একটা দারুণ সাড়া ফেলে দেবে।'

মোম ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'ওসব ভুজংভাজুং বন্ধ করো শুদ্ধদা। তোমাকে বিশ্বাস করি বলে তুমি এই কাণ্ড করবে আমি ভাবতে পারিনি! বুলুর কথা শুনে মাকে ফোন করলাম। মা তো খেপে আগুন। বলছে, তুই এখুনি প্যাক করে চলে আয়। ওই দেখ আবার ফোন করছে।'

সত্যি সত্যি মোমের হাতের মোবাইল বেজে উঠল। মোম কানে তুলে বলল, 'বলো...আরে না না এখনও কিছু সেটল হয়নি...কথা বলছি তো...তুমি এখন ছাড়ো...।'

শুদ্ধনাথের মাথায় আগুন চড়ে গেল। কিন্তু আগুন নিয়ে কোনও কাজ হবে না। এখন লাগবে জল। জল দিয়ে মোম চ্যাটার্জিকে শান্ত করতে হবে।

শুদ্ধনাথ মোমের দিকে এক পা এগিয়ে এসে শান্ত গলায় বলল, 'সামান্য একটা জিনিস নিয়ে কেন এত চিন্তা করছ? তোমার সুন্দর পা দু'টো যদি আমরা কয়েকটা শটে কাজে লাগাই তোমার সমস্যাটা কোথায়?'

মোম তেড়েফুড়ে উঠল। বলল, 'অবশ্যই সমস্যা। শুধু পা কেন আমার শরীরের আরও অনেক কিছু সুন্দর। তা বলে সেগুলোকেও কাজে লাগাতে হবে! তাছাড়া অ্যাড বিসকিট নিয়ে না মেয়ে মানুষের পা দিয়ে? পা নিয়ে তোমরাই বা এত ভাবছ কেন?'

শুদ্ধনাথ শুকনো হাসল। হাসতে হাসতেই চিন্তা করতে লাগল। মেয়েটা এত জোর দেখাচ্ছে কেন!

'এটা একটা আনপ্রফেশনাল কথা হয়ে গেল না মোম? আজকাল বিজ্ঞাপনের প্যাটার্নটাই বদলে গিয়েছে। তিরিশ চল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে প্রোডাক্ট প্রায় থাকে না বললেই চলে। থাকলেও অনেক দূর থেকে আবছা ভাবে থাকে। ডাইরেক্ট প্রোডাক্ট দেখালে এখন মার্কেটিং হয় না।'

মোমের উরুর একটু নীচ পর্যন্ত তোয়ালে ঝুলছে। সেই অবস্থায় চেয়ারে বাকি পাটুকু সামনে দিয়ে বলল, 'অত লেকচার শুনে আমার কাজ নেই। প্রথম যখন কনসেপ্টটা শুনেছিলাম, তখনই বুঝেছিলাম, ডাল মে কুছ কালা হয়। ঠিক আছে আমার ফিগার ভাল, তোমরা তো একটু ইউজ করবেই, তা বলে এতখানি আমি ভাবতে পারিনি। দ্যাখো, শুদ্ধদা অন্য কেউ হলে এতক্ষণ অপেক্ষা করতাম না। কস্টিউম খুলে, মেকআপ তুলে বাড়ি চলে যেতাম। তুমি বলেই সেটা পারছি না। আমি অপেক্ষা করছি, তুমি একটা কিছু ভেবেচিন্তে ওয়ে আউট বের করো। সরি, এতখানি শরীর আমি দেখাতে পারব না।'

শুদ্ধনাথ কাতর গলায় বলে, 'শরীর কোথায়? এ তো পা!'

মোম এবার হেসে ফেলল। বলল, 'এটা ভাল বলেছ, এরপর তোমরা বলবে, তোমার শরীর কোথায়, ও তো তোমার বুক!'

বুলু মুখে হাত চাপা দিয়ে 'খিক খিক' ধরনের আওয়াজ করে হাসল। শুদ্ধনাথ কড়া চোখে তাকায়। মেয়েটাকে একটা থাবড়া মারলে শান্তি হবে। কিন্তু শান্তির থেকেও আগে দরকার ব্যবসা। শহুরে মেয়ের জামাকাপড় নিয়ে মোম যখন এত ঝামেলা শুরু করেছে, গ্রামের বেলায় আরও তো অনেক বেশি গোলমাল পাকাবে। যে মেয়েটি দিয়ে ধান কাটানোর কথা ভাবা হয়েছে তার কস্টিউম তো আরও খোলামেলা ভাবা হয়েছে। শাড়ির নীচে কাঁচুলি ধরনের কিছু পরানো হবে। পিঠ, কাঁধ এবং বুকের অনেকটা খালি রাখতে হবে। এই কস্টিউম পার্টিই পছন্দ করে পাঠিয়েছে।

শুদ্ধনাথ কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'তুমি কী চাইছ?'

মোম নিচু গলায় কেটে কেটে বলল, 'আমি কিছু চাইছি না। তোমাকেও কিছু চাইতে হবে না। তুমি হায়দরাবাদে তোমার ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা বলো। এগারোজনকে বাদ দিয়ে তিনি যখন আমাকে বেছেছেন তার চাওয়াটাই আসল। তুমি তো আমার জন্য আলাদা করে কিছু করোনি, অন্যদের জন্যও ট্রাই করেছিলে। এমনকী বিদিশার ফোটোও ওখানে কাছে পাঠিয়েছিলে। বলো পাঠাওনি?'

শুদ্ধনাথ বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল। সে যে আশঙ্কা করছিল, সেটাই তা হলে সত্যি হল। এগারোজনকে বাদ দেওয়ার কথাটা মোম জেনে গেছে। শুধু সেটুকুই নয়, পার্টি যে হায়দরাবাদে তাও জেনেছে! এটা হওয়ারই কথা ছিল। ইনডাস্ট্রিতে কথা গোপন রাখা কঠিন। মুম্বই বা সাউথ ইন্ডিয়া হলে কথা ছিল। এখানকার জগত তো এইটুকু।

'তুমি এসব কী করে জানলে?'

মোম কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'কী করে জানলাম সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা ঘটনাটা সত্যি কি না।'

'হ্যাঁ সত্যি। পার্টি অনেকেরই ফোটোই দেখতে চেয়েছিল। আর সেটা কোনও অন্যায় নয়। তার প্রোডাক্ট, কোন ধরনের মুখ স্যুট করবে সেটা দেখার অধিকার তার নিশ্চয় আছে।'

'মুখ কেন বলছ শুদ্ধদা? ফিগার বলো। তুমি ইচ্ছে করলে বিদিশাকে বাদ দিতে পারতে। ওই মেয়ে ইতিমধ্যে আমাকে দু'টো কাজ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। যদিও আমি বদার করি না। ওর মতো যখন-তখন কাপড় খুলে যারতার খাটে উঠতে পারব না।'

কথার মাঝখানেই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বুলু হেসে উঠল আবার। মোম চোখের ইশারা করল। অসন্তুষ্ট মুখে ঘর ছাড়ল বুলু।

শুদ্ধনাথ বলল, 'সবার সম্পর্কে এ ধরনের কমেন্ট করা কি ঠিক হচ্ছে মোম?'

'আমি তো সবার সম্পর্কে বলছি না, বলছি পার্টিকুলার একজনের সম্পর্কে। তমা বা বাঁধন বা ঐন্দ্রিলাকে জড়িয়ে এরকম আমাকে কখনও বলতে শুনেছ? ওই বিদিশা...।'

'যাই হোক, এসব আলোচনা এখন করার সময় নয়। লাইট টাইট সব রেডি হয়ে গেছে, এখন যদি তুমি না বলো সেটা খুব বাজে হবে।'

মোম সামান্য হেসে বলল, 'তুমি এত টেনশন নিচ্ছ কেন শুদ্ধদা? তোমার সঙ্গে তো আমার কোনও সমস্যা নেই। আমার শর্টস্-এর লেন্থ কতটা বাড়ালে পার্টি তোমার কাজটা নিতে পারবেন জেনে নাও। জগিং মানে তো আর থাই পর্যন্ত পা দেখানো নয়, ক্যেপরি বা জগিং স্যুটেও কাজ চলতে পারে। সাউথ সিটি মল থেকে চট করে একটা কিনে আনলেই হবে। আর যদি তোমার ওই পার্টি বলেন, না, বিসকিটে গ্লুকোজের সঙ্গে উনি আমার পা, পেট আর বুকও চাইছেন তা হলে অন্য কথা। জগিং-এর যা রেট, উরু বা পেট তো আর সেই পয়সায় বেচা যায় না। নাকি সেটা উচিত? তুমিই বলো না? কেনা-বেচার মধ্যে সারাক্ষণ থাকো, মুড়ি মিছরির আলাদা আলাদা দামের ব্যাপারটা তোমরাই তো সবথেকে ভাল বুঝবে। এই পা দু'টো কি বেচার মতো সেক্সি নয়? নাকি ফ্রিতে বিলিয়ে দেওয়ার মতো বিশ্রি?'

কথাটা বলে ভুরু নাচিয়ে হাসল মোম।

শুদ্ধনাথ ঢোঁক গিলল। দুনিয়াটাই এরকম। একই বিষয়ে কখনও পুরুষ শাসন করে, কখন ছড়ি চলে যায় মেয়েদের হাতে। কাজটা করার সময় ভেবেই রেখেছিল, মোমের শরীরটা যতখানি পারা যায় ক্যামেরায় ধরে নেবে। খুব কিছু একটা না বলেই নেবে। মোম বুঝতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে যেতে হল। কিছু করার নেই, মোম অনেকদূর জেনে ফেলেছে। এবার তো চাপ দেবেই। এটাও সত্যি, তাকে কস্টিউমের ব্যাপারটা সবটা খুলে বলা হয়নি। নতুন আলটপকা কেউ হলে কথা ছিল, মোম চ্যাটার্জির মতো গোলমেলে মেয়েকে নিয়ে এটা করা বোকামিই হয়ে গেছে। শুদ্ধনাথ শান্ত গলায় বলল, 'মোম তুমি ঠিক কী চাইছ সেটা স্পষ্ট করে বলো তো।'

বাঁ হাতে চুলে বাঁধা রিবনটা খুলতে খুলতে মোম বলল, 'বিদিশাকে কাজটা করে দেওয়ার জন্য বলতে পারো। ধরো সে বাথটাবে শুয়ে শুয়ে বিসকিট চিবলো। গলা পর্যন্ত সাবানের ফেনায় শরীর ডোবানো। বুদবুদের ফাঁকে ফাঁকে বুক টুকু একটু দেখা গেল, একটু গেল না। তোমার বিসকিটও হল, আবার শরীরও হল।'

'এটা কি একটা ব্ল্যাকমেলের মতো হয়ে যাচ্ছে না মোম? একেবারে লাস্ট মোমেন্টে তুমি বেঁকে বসছ। ট্রেডে কি এটা চলে? নর্মস বলে একটা কথা আছে। তুমি কন্ট্র্যাক্ট সাইন করেছ। ডেট দিয়েছ।'

মোম ঘাড় কাত করে চোখ বড় বড় করল।

'তাই নাকি? কন্ট্রাক্টের কোথায় লেখা আছে আমাকে ন্যুড হয়ে দৌড়োতে হবে? তাছাড়া আমি আগে বলব কী করে? আমি কি জানতাম তুমি আমাকে ছাড়াও আরও এগারোজনের জন্য চেষ্টা করেছিলে। খবরটা এই তো একটু আগে শুনলাম। মেকআপ নিয়ে, কস্টিউম পরে মোবাইলে গল্প করছিলাম তখন...'

'কে বলল?' শুদ্ধনাথ ভুরু কোঁচকালো।

'সেটা আর নাই বা শুনলে। তোমার মন খারাপ হয়ে যাবে। বিশ্বাসঘাতকের নাম শুনলে মন খারাপ হয়ে যায়।' কথা বলতে

বলতেই মাথা ঝাঁকিয়ে সুন্দর চুলগুলো এলোমেলো করে দিল মোম। এর অর্থ সে সত্যি সত্যি চলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে।

শুদ্ধনাথ এবার একটু কড়া গলায় বলল, 'ও তা হলে এসব শর্টস্, টি-শার্ট বাজে কথা বলো, আসলে তুমি আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছ। তাই তো?'

মোম এবার আওয়াজ করে হাসল। হাসির তালে তালে ফরসা নরম পায়ের ওপর অন্য পা-টা চাপিয়ে নাড়াল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'ধরে ফেললে? তা তো কিছুটা চাইছি শুদ্ধদা। তবে তুমি কিন্তু মাইরি মিছিমিছি আমার সঙ্গে রিলেশন খারাপ করছ। সামান্য বিসকিটের জন্য এটা করা কি তোমার উচিত হচ্ছে? তার থেকে তোমার ওই পার্টিকে একটা কল করো না বাপু। এই দেখ মা আবার ফোন করেছে, নিশ্চয় চলে যেতে বলছে। উফ মহিলা কিছু জ্বালাতে পারে বটে! বলো মা... আরে বলছি তো আমি জামা প্যান্ট খুলতে পারব না বলো?'

কথার মাঝখানেই ডান হাতের একটা আঙুল তুলে শুদ্ধনাথকে দেখাল মোম। এর অর্থ এক মিনিটের জন্য ঘরের বাইরে যেতে হবে। শুদ্ধনাথ উঠে এল। তাকে বাইরে আসতে দেখেই প্রোডাকশনের অঙ্কু হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, 'কী হল দাদা?'

শুদ্ধনাথ থমথমে মুখে গলা নামিয়ে বলল, 'কিছু হয়নি, একটু ওয়েট করো, কাজ শুরু হবে।'

'কোনও গড়বড়?'

শুদ্ধনাথ ভুরু কুঁচকে বলল, 'না না, বলছি তো কিছু নয়। কিছুক্ষণের মধ্যে শট নেব। তোমরা আর একবার সব চেক করে নাও। সুদীপ্তকে বলো ট্রলিটা একটু সরিয়ে নিতে। প্রথমে গাছের পাতার ভিতর দিয়ে ক্যামেরা মুভ করবে। তারপর আমরা মোমের পা দু'টো ধরব।'

শুদ্ধনাথ বুঝে গেছে তাকে কী করতে হবে। মোম চ্যাটার্জিকে সামলানোর একটাই পথ। টাকা বাড়িয়ে দেওয়া। বোকামির জরিমানা বলা যেতে পারে। ফোটো পাঠানোর ব্যাপারে আরও গোপনীয়তা রক্ষা করা উচিত ছিল। টেলিফোনের ওপাশ থেকে ওর মা আসলে সেই পরামর্শই দিচ্ছে। সেটা কত এখন সেটাই হচ্ছে কথা। দেখা যাক কতটা কমানো যায়।

লাঞ্চের ঘণ্টা দুই পরেই কাজ শেষ হয়ে গেল। যতটা সম্ভব কম এনজি হয়েছে। অর্থাৎ ক্যামেরা চালানোর পর শট বাতিল প্রায় করতে হয়নি বললেই চলে। মোম চ্যাটার্জি তুখোড় অভিনেত্রী বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। সকালে দরদামের জন্য যতটা দেরি করেছিল, পরে পুষিয়ে দিল। ওভারটাইমের খরচটা বেঁচে গেল। মেয়েটা কাজও করেছে মারাত্মক। শুধু চাপা ছোট শর্টস পরে দৌড়োয়নি, দৌড়োতে দৌড়োতে হাত ছড়িয়ে এক্সারসাইজ করেছে, লাফ দিয়ে গাছের পাতা ছুঁয়েছে। গাছের পাতা ছোঁয়ার দৃশ্যটা শুদ্ধনাথের একেবারেই ভাবা ছিল না। মোম নিজে থেকেই ইমপ্রোভাইস করল। হাত উঁচু করে লাফ দেওয়ার সময় বেতের মতো লিকলিকে শরীরটা একেবারে ঝকমক করে উঠল। বুক থেকে শুরু করে, পেট, নিতম্ব, পায়ের গোছ পর্যন্ত শূন্যে চকিতে ঢেউ তুলল যেন। শুদ্ধনাথের কথা শুনে বাধ্য মেয়ের মতো তিনদিক থেকে এই লাফের দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করাল মোম। প্রত্যেকটা শটই পারফেক্ট। শুদ্ধনাথ মনিটরে বসেই চিৎকার করে উঠল, 'বিউটিফুল। প্যাক-আপ।'

ট্যাক্সিতে ওঠবার সময় শুদ্ধনাথের কাছে এসে দাঁড়ায় মোম। মুচকি হেসে বলল, 'কি কাজ ঠিক আছে তো।'

শুদ্ধনাথ গদগদ গলায় বলল, 'সেন্ট পার্সেন্টেরও বেশি।'

'ডোন্ট মাইন্ড শুদ্ধদা। সরি, আজ বোধহয় ব্যবহারটা একটু বেশি হার্ড হয়ে গিয়েছিল। আসলে ফট করে যখন শুনলাম, তুমি আমাকে ছাড়াও অনেকের নাম পাঠিয়েছিলে মাথাটা ঠান্ডা রাখতে পারিনি।'

ক্লান্ত শুদ্ধনাথ হেসে বলল, 'না ঠিকই আছে। তোমার কাজ তুমি করেছ। তোমার মার্কেট এখন হাই।'

মোম শুদ্ধনাথের হাতটা ধরে নিচু গলায় বলল, 'কী করব বলো শুদ্ধদা? এক সময় ফ্রিতে জামা খুলেও কাজ পেতাম না। তোমরা পাত্তা দিতে না। ঘাঁটাঘাটি করে তাড়িয়ে দিতে। এখন একটু দেখাতে গেলেও পাই পয়সা বুঝে নিই। খারাপ করি? দাদা, তুমি বেচ তোমার পার্টিও বেচে, আমি কেন বেচব না বলো?'

প্রাণহীন হাসল মোম।

শুদ্ধনাথ তাড়াতাড়ি বলল, 'বললাম তো ইটস ওকে। আমি নিজেও বুঝেছি, আমার দিক থেকে একটা ভুল হয়েছিল। আগেই সবটা বলে রাখা উচিত ছিল। আমি সেটা বুঝেছি বলেই তো হায়দরাবাদে ফোন করে টাকাটা বাড়িয়ে নিলাম।'

মোম ঘাড়টাকে একপাশে কাত করে ঠোঁটের ফাঁকে হাসল। বলল, 'তাই? ফোন করেছিলে? নাকি নিজেই বাড়িয়ে দিলে? যাক, আমি পেয়েছি সেটাই যথেষ্ট। থ্যাঙ্কু।'

মোম ভেবেছিল, বাড়িতে পৌঁছেই লম্বা সময় ধরে একটা স্নান সারবে, তারপর কোনও কথা না বলে বিছানায় এলিয়ে পড়বে। কিন্তু তা হল না। বাড়িতে ঢুকেই দেখল, ড্রইংরুমের বেতের চেয়ারে বসে আছে এক সুদর্শন যুবক! একা একাই বসে আছে। অন্যমনস্ক ভাবে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে।

'তুমি! আপনি সোমনাথদা?' মোমের মুখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

সোমনাথ ফিরে তাকাল। উঠে দাঁড়িয়ে বোকার হাসি হেসে বলল, 'একটা জরুরি কথা বলতে দুম করে চলে এসেছি। অ্যাপয়েনমেন্ট ছাড়াই এলাম।'

উল্টোদিকের চেয়ারে কাঁধের ব্যাগটা ছুড়ে দিতে দিতে মোম চোখে মুখে কৌতূহল এনে বলল, 'জরুরি কথা? আমার সঙ্গে? মোবাইলে ধরলেন না কেন?'

'ট্রাই করেছিলাম, সুইচড অফ ছিল। শুটিং-এ ছিলে বোধহয়। তোমার মা বললেন, সন্ধের আগেই ফিরে আসবে।' মোম দ্রুত হাতে ব্যাগ থেকে ফোন বের করল। সত্যি মোবাইল অন করতে ভুলে গেছে। ইস।

সোমনাথ বলল, 'একটা রিকোয়েস্ট করব মোম, না বলবে না বলো।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল মোম। সোমনাথের চোখের দিকে মুহূর্তখানেক স্থির ভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, 'ঠিক আছে বলব না।'

'আমার সঙ্গে দু-তিনদিনের জন্য তোমাকে কলকাতার বাইরে যেতে হবে।'

'বাইরে! তোমার সঙ্গে? কোথায়?'

মোম একটু অবাকই হল। সোমনাথকে আচমকা দেখে সে কি এতটাই খুশি যে তুমি, আপনি গুলিয়ে ফেলছে! সোমনাথ বলল, 'ঝিলডাঙা'।

নামটা বলেই সোমনাথ একটু লজ্জা পেল। ঝিলডাঙা এমন কোনও জায়গা নয় যে বিশ্বশুদ্ধ সবাই তার নাম জেনে বসে আছে।

'আসলে কাজটা হল...'

মোম হাত তুলে বলল, 'থাক, কাজ জেনে আমার দরকার নেই, আমি যাব। কী যেন নাম বললেন জায়গাটার? কী ডাঙা?'

মেয়েটা এক কথায় রাজি হয়ে যাবে ভাবতেও পারেনি সোমনাথ। সে খানিকটা বিড়বিড় করেই বলে, 'ঝিলডাঙা'।

'হ্যাঁ ঝিলডাঙা। বাঃ খুব সুন্দর নাম তো।'

মোম আরও সুন্দর করে হাসল। হেসেই বুঝতে পারল, বহুদিন পর সে সত্যিকারের হাসল। ভেতর থেকে।

পরের এপিসোড আগামী রোববার

ছবি শান্তনু দে

চিমনিচিন্তা চমৎকারা

ইউ বোলে তো তুমি
চু বোলে তো চুমুক
দেব রায়

স্যুপ রান্নায় অন্য কোনও সূপকার চিনাদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে না। চিনারা হাতপাখা, চিনামাটির বাসন-কোসন, মার্শাল আর্ট-এর মতোই স্যুপ রান্নাকেও অনন্য শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। বিবিধ স্টক-এ সবজি, মাছ, মাংসের টুকরো সমেত গরম এক বাটি স্যুপ খেতে যেমন দুর্দান্ত তেমনি পোষ্টাই। তেল-মশলা প্রায় নেই বলেই গুরুপাকও নয়। তাই মূল খাবার শুরুর আগে স্টার্টার হিসেবে কিংবা হাল্কা জলখাবার হিসেবে স্যুপ-এর তুলনা হয় না। চাইনিজ স্যুপ-এর নানারকম সম্ভারের মধ্যে এক মেহনতি স্যুপের কথা আজ বলব। আরে যে স্যুপ-এর নাম 'চিমনি স্যুপ' তাকে মেহনতি না বলে উপায় কী? চিমনি স্যুপ বানাতে যেমন মেহনত দরকার, খেতেও তেমনি। একটা গোটা চিমনি স্যুপ সাবাড় করতে হলে অন্তত জনা ছয়েক উপোসী মানুষ একজোট হওয়া দরকার। এমনটাই চালু আছে। কিন্তু তার আগে আচুমপা হুয়াং-এর কথা বলা দরকার।

তখন ব্রিটিশরাজ চলছে। ১৯২৭-২৮ নাগাদ চিন দেশের মো-ইয়ান প্রদেশ থেকে আচুমপা হুয়াং কলকাতায় এসে চিনে খাবারের দোকান খোলেন। নাম দেন 'ইউ চু'। অর্থাৎ কি না সাহেবসুবো। চাঁদনি চক মেট্রো থেকে উঠে আর এন মুখার্জি রোড ধরে দু'কদম এগলেই বাঁ হাতে একটা প্রেট্রল পাম্পের পিছনে পুরনো বাড়ির দোতলায় আজও 'ইউ চু' স্বমহিমায় বর্তমান। রসিকজন জানেন যে অথেনটিক চাইনিজ খাবারের যে ক'টা হাতেগোনা ঠেক আছে তার মধ্যে অন্যতম 'ইউ চু'। এবং 'ইউ চু'র সবচেয়ে বিখ্যাত পদ ওই 'চিমনি স্যুপ'। অমন স্বাদু আগুনতাজা, চিমনি স্যুপ পেলে চেটেপুটে সত্যজিৎ রায় বর্ণিত 'চিমনি চাটা ভোঁপসামুখো ভোপাটে' হওয়া যায়।

আদতে চিমনি স্যুপ চিন দেশের কমিউনিটি কিচেন বা বড় একান্নবর্তী পরিবারের সৃষ্টি। হেঁসেলে বড় কড়াই-এ স্যুপ ফুটছে। যে যার পছন্দ মতো কিংবা বরাদ্দ মতো সবজি, মাছ বা মাংসের টুকরো সেদ্ধ করে নিচ্ছে চপ স্টিক দিয়ে ওই স্যুপের মধ্যে ধরে। এভাবে ফুটন্ত স্যুপে ক্রমশ মিলছে বিভিন্ন সবজি, মাছ, মাংসের নির্যাস। আর মাঝে মাঝে চপ স্টিক ফস্কে দু-চারটে সলিড টুকরোও মিলছে স্যুপে। হেঁসেলের চিমনির চারপাশে চপ স্টিক হাতে গোল

হয়ে বসে খাওয়া দাওয়া শেষ হলে ওই স্যুপটা তখন প্রত্যেকের বাটিতে ঢেলে দেওয়া হত। সেই থেকে 'চিমনি স্যুপ'। আচুমপা হুয়াং নিজের রেস্তোরাঁর জন্য চিমনি স্যুপের কনটেনার বানিয়ে নিয়েছিলেন। নীচের স্তরে কাঠ কয়লার আগুন, সেই আগুন ওপরের স্তরের স্যুপকে সবসময় গরম রাখবে আর মাঝের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরনোর পথ। আচুমপা হুয়াং-এর নাতি-পুতিরা এখন 'ইউ চু'র দায়িত্বে এবং সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। নিরাভরণ অথেনটিক চিনা রান্না আর গোটাটাই ফ্যামিলি অ্যাফেয়ার। আজও যোসেফ হুয়াং নিজের হাতে বাজার করেন। স্ত্রী যোসেফাইন পুত্র যোয়েল এবং কন্যা জেনিফার পালা করে রেস্তোরাঁ সামলান, রান্না করেন। এবং 'পপ এন মম' স্টোরগুলো যেরকম হয়, এঁদেরও বিজনেস আওয়ার নিজস্ব সময় বাঁচিয়ে। সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে দুপুর আড়াইটে, আবার সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত দশটা। দুপুরে থাকে অফিস পাড়ার কর্পোরেট ভিড়, সন্ধ্যার সময় ফ্যামিলি ডাইনিং। না, প্রেম করার সুবিধা নেই। কারণ জনা পঞ্চাশ বসবার মতো এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁয় তেমন আড়াল আবডাল কিছু নেই। তবে দ্যাবাদেবি দু'জনেই ভোজনরসিক হলে চিমনি স্যুপ আর যোসেফাইন নুডলস-এ জাস্ট জমে যাবে। আজ্ঞে হ্যাঁ, রেস্তোরাঁর মালকিন-এর নামে এই ডিশটা প্যান ফ্রায়েড নুডলস-এর সঙ্গে বিবিধ সবজি, চিকেন, প্রন আর স্পেশাল সস-এ তৈরি এক অপূর্ব ডিশ। আধঘণ্টা আগে অর্ডার দিতে হয়, যোসেফাইন নুডলস, কিন্তু খেলে, 'ওহ ফাইন সুপার্ব!' বলা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। 'ইউ চু'-র স্পেশাল সস আসে হংকং থেকে। এছাড়া চিনা সস-মশলা আসে টেরিটি বাজারের নাম করা চিনা দোকান থেকে। চিনা সবজি 'পক চয়'ও আসে টেরিটি বাজার থেকে। চিংড়ি আসে মানিকতলা থেকে, মাছ, চিকেন, পর্ক নিউ মার্কেট থেকে। আর তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটা পরিবারের অশেষ যত্ন, শ্রম আর ভালবাসা। তাই এই সাদামাটা পকেট ফ্রেন্ডলি রেস্তোরাঁয় মুনমুন সেন, জুন মালিয়া সহ আরও বহু বিখ্যাত মানুষজন বারবার আসেন অসাধারণ ডিমসাম, স্যুপ, ফিশ, চিকেন ইত্যাদির ডিশগুলোর জন্য।

চিমনি স্যুপ বাড়িতে বানানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। তবে যোসেফ-যোসেফাইন দম্পতি ট্রেড সিক্রেট ফাঁশ করতে আগ্রহী নন। মোদ্দাটা দেওয়া গেল। পুরো জানতে হলে যোসেফাইন হুয়াংকে রাজি করাতে হবে।

এক বউল চিমনি স্যুপ বানাতে লাগবে

চিকেন স্টক—৬ কাপ
ছোট চিংড়ি—২০ টা
বোনলেস চিকেন—১০০ গ্রাম
ভেটকির ফিলে— ৪ টুকরো
পক চয় বা পালংপাতা—১ আঁটি
ডিম—৪ টি
গোলমরিচ গুঁড়ো—স্বাদমতো
নুন—স্বাদমতো

এবার

প্রথমে চিকেন-স্টক ফুটিয়ে নিন। এবার চিংড়ি, চিকেন, ভেটকির ফিলে এবং পক চয় কুচিয়ে দিন। সমস্ত উপকরণ সিদ্ধ হয়ে এলে নুন গোলমরিচ ছড়িয়ে নামিয়ে গরমগরম পরিবেশন করুন।

ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

Power, Port, Industrial Infrastructure, Real Estate and Township Development, Hospitality, Manufacturing

Universal Success Enterprises Limited

Singapore :
8 Temasek Boulevard
40-01A Suntec Tower 3
Singapore – 038988
Tel : +65-6836-3955 / 3058
Fax: +65-6836-0377

Kolkata :
Chowringhee Court,
4th Floor, Unit – 20 & 21
55 & 55/1 Chowringhee Road
Kolkata : 700071, India
Tel : +91-33-40026104 / 22
Fax : +91-33-22828703

Mumbai :
Makers Chambers No. VI
Unit Nos. 103 & 104, 10th floor
Backbay Reclamation
Nariman Point
Mumbai : 400021, India
Tel : +91-22- 43410310
Fax : +91-22-43410303

Branch Office : Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Bangkok, Delhi

indiacontact@usel.biz
www.usel.biz

Ideainc/USE/09

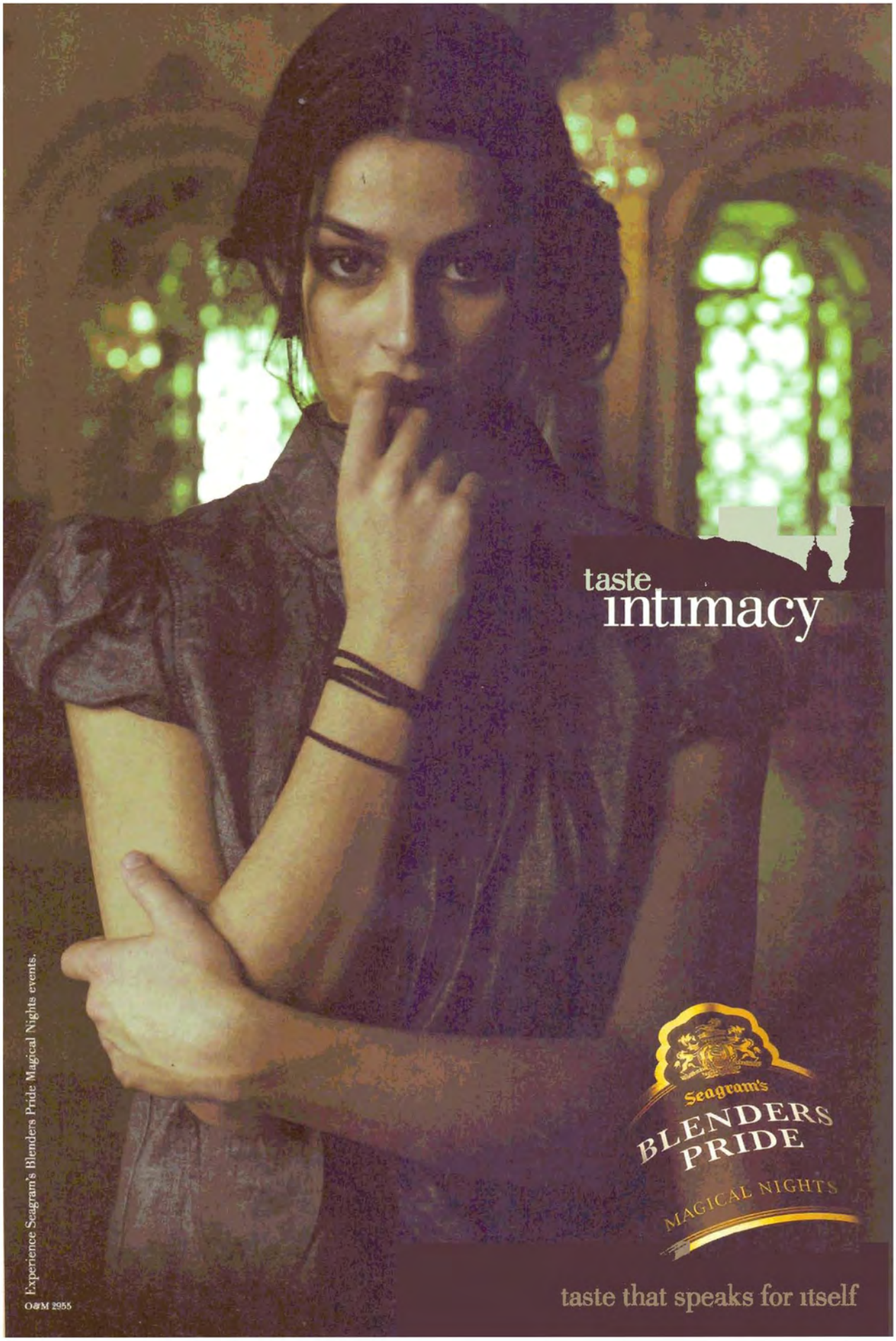
taste
intimacy
Seagram's
BLENDERS
PRIDE
MAGICAL NIGHTS
taste that speaks for itself
Experience Seagram's Blenders Pride Magical Nights events.
O&M 2955